বৈষ্ণব নামধারী অপ-সম্প্রদায়

শ্রী মনোরঞ্জন দে

বৈষ্ণব নামধারী অপ-সম্প্রদায়

প্রকাশক ঃ সাবিত্রী রাণী দে।
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র।

বিঃ দ্রঃ এই বইয়ের সমূদয় অর্থ কৃষ্ণ সেবায় ব্যয় করা হবে। তাই একটি বই ক্রয় করে আপনিও কৃষ্ণ সেবায় অংশ নিতে পারেন এবং অন্যকেও বইটি ক্রয়ে উৎসাহিত করতে পারেন।

লেখকের অপরাপর বইঃ

১. বৈষ্ণব সম্প্রদায়
২. দ্বাদশ গোপাল এবং চৌষট্টি মহান্ত

লেখকের পরবর্তী বই ঃ

১. হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র
২. রাধা তত্ত্ব

উৎসর্গ

যাঁর একটিমাত্র বই পড়েও আমি
অভিভূত হয়েছি সেই পরম পূজ্যপাদ বৈষ্ণব মহাজন
ত্রিদন্ডী ভিক্ষু শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি
মহারাজ-এর করকমলে।

শূদ্রাধম,
মনোরঞ্জন দে।

লেখকের নিবেদন

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্"

আমি শূদ্রাধম। তাই পারমার্থিক জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা যে আমার নেই সে বিষয়ে নিশ্চিত। কারণ জড়জাগতিক বিষয়েই আমি লিপ্ত। এরপরও অতি দুঃসাহসে মাঝে মধ্যে কিছু পারমার্থিক বই পড়ার নিষ্ফল চেষ্টা করি মাত্র। কারণ হরি-গুরু এবং বৈষ্ণবের কোন কৃপা এই অধমের ভাগ্যে এখনও জোটেনি।

বহুদিন পূর্বে শ্রদ্ধেয় শ্রী পতিত উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী মহোদয় কথা প্রসঙ্গে একসময় বলেছিলেন, বৈষ্ণব নামধারী অপসম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু লিখেন না কেন? তিনি এই ব্যাপারে আমাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কর্তৃক লিখিত **বঙ্গে সামাজিকতা** (বর্ণ ও ধর্ম্মগত সমাজ) বইটী পড়ে দেখতে বলেন। এই অতি মূল্যবান বইটী পড়ে এক সময় মনে হল যে শ্রী শ্রী রাধামাধবের কৃপা হলে আমার মতো জ্ঞানহীন লোকও হয়তো চেষ্টা করলে এই বিষয়ে ক্ষুদ্র একটা বই সংকলন করতে পারবে। আর তারই অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হল **"বৈষ্ণব নামধারী অপসম্প্রদায়"** বইটী।

এই বই সংকলন করতে গিয়ে ভাগবত প্রবর **শ্রীসুগতিশ্বর দাসাধিকারীর** কাছ থেকে সব সময় অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তাছাড়া যখনই কোন গ্রন্থ দরকার পড়েছে তিনি অকৃপণভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রী শ্রী মাধ্ব গৌড়ীয় মঠের শ্রীপাদ মধুসূধন মহারাজ-এর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। তাই আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

আর যে সব গৌড়ীয় ভক্ত এই অধমকে বই লিখতে কৃপাশীর্বাদ এবং উৎসাহিত করেছেন তারা হলেন শ্রী পদ্মনাভ মহারাজ, ভাগবত প্রবর শ্রী প্রেমরতন গাইন, ভাগবত প্রবর শ্রী মুকুল পদ মিত্র, শ্রী অজিত কৃষ্ণ দাস

ব্রহ্মচারী, শ্রী অনিল কুমার ঘোষ, শ্রী উজ্জ্বল নীলমণি দাস, শ্রী নরহরি দাস, শ্রী দীপক গুপ্ত, শ্রী মাধব দাস, শ্রী হরিপদ দত্ত, শ্রী হরিপদ পোদ্দার, শ্রী অজিতেষ দাস ব্রহ্মচারী, ডা: শ্রী বিমলা প্রসাদ দাস, শ্রী সত্যেন বিশ্বাস, শ্রী তপন রায়, শ্রী জয়দেব কবিরাজ, শ্রী সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, শ্রী কে. বি. দেবনাথ, শ্রী গোপাল গোবিন্দ দাস, শ্রী কিশোর কুমার মন্ডল, শ্রী কালীপদ সরকার, শ্রী বিমল সরকার, শ্রী বিশ্বজিত মোদক, শ্রী নির্মল সরকার, শ্রী রাখাল চন্দ্র সূত্রধর, শ্রী লিটন চন্দ্র শীল, ছায়া মাতাজী প্রমুখ।

এছাড়া শ্রী শ্রী বঙ্কুবিহারী জিউ মন্দিরের শ্রী হরিপদ প্রভু, শ্রী দীপক দেবনাথ, শ্রী নারায়ণ সরকার, শ্রী নারায়ণ নাগ, শ্রী সুবীর পাল, শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাল, শ্রী স্বপন চন্দ্র সূত্রধর, শ্রী হিমাংশু দাস প্রমুখ ভক্ত সব সময়ই এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন বলে আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ। তাছাড়া শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের শ্রী রাজকুমার ঘোষ, শ্রী নীল কমল ঘোষ ও শ্রীমতি শিল্পী কৃষ্ণা দাসী বইটি তাড়াতাড়ি প্রকাশের জন্য সব সময় তাগাদা দিয়েছেন। সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

বইটি সংকলনের জন্য স্নেহভাজন ছাত্র শ্রী হেমন্ত কুমার সিংহ এবং শ্রীরাজকুমার সাহা কিছু মূল্যবান তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করায় ওদেরকে আন্তরিকভাবে আশীর্বাদ করছি। এই বইয়ের কিছু জায়গায় প্রয়োজনের খাতিরে কতিপয় শ্লোক একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে এই বই আমার সৃষ্ট কিছু নয়। বিভিন্ন উৎস থেকে ক্ষেত্র বিশেষে হুবহু তথ্য তুলে ধরেছি। তাই এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও অবদান নেই। প্রকৃত গৌড়ীয় ভক্তরা এ থেকে কিছুটা উপকৃত হলেই এই দীন অভাজন কৃতার্থ হবে।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
মনোরঞ্জন দে।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
১ বৈষ্ণব নামধারী অপসম্প্রদায় কি?	৭
২ প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়	৮
২.১ প্রারম্ভিক আলোচনা	৮
২.২ সহজিয়া মতবাদের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১০
২.৩ মহাপ্রভু, ষড়গোস্বামী এবং পার্ষদগণ সম্পর্কে সহজিয়াদের ধ্যান-ধারণা	১৩
২.৪ সহজিয়াদের দেহকেন্দ্রিক সাধন-ভজনের উৎস এবং পদ্ধতি	২৪
২.৫ কেন প্রাকৃত সহজিয়ারা অপ-সম্প্রদায়?	৩৭
৩. গৌরনাগরী সম্প্রদায়	৪৫
৪. গৌরবাদী এবং নবগৌরাঙ্গী সম্প্রদায়	৫১
৫. কিশোরী ভজন সম্প্রদায়	৫৫
৬. আউল–বাউল সম্প্রদায়	৬২
৭. নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়	৭৩
৮. অতিবড়ী সম্প্রদায়	৭৪
৯. স্পষ্টদায়িক সম্প্রদায়	৭৫
১০. চূড়াধারী সম্প্রদায়	৭৬
১১. সখীভেকি সম্প্রদায়	৭৮
১২. জাত গোস্বামী/গোঁসাই সম্প্রদায়	৮২
১৩. কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়	১১১

১ বৈষ্ণব নামধারী অপসম্প্রদায় কি?

বৈষ্ণব সমাজে শাস্ত্রানুযায়ী (পদ্ম পুরাণ দ্রষ্টব্য) চারটি সম্প্রদায় স্বীকৃত। এরা হলেন শ্রী সম্প্রদায় (আচার্য রামানুজ প্রবর্তিত), শ্রীমাধ্ব সম্প্রদায় (শ্রী মধ্বাচার্য প্রবর্তিত), শ্রী নিম্বার্ক সম্প্রদায় (শ্রী নিম্বাদিত্য প্রবর্তিত) এবং শ্রী রুদ্র সম্প্রদায় (শ্রী বিষ্ণুস্বামী প্রবর্তিত)। এই চার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোন একটির অনুগত না থাকলে কোন ব্যক্তি প্রকৃত বৈষ্ণব বলে গ্রহণযোগ্য হতে পারেন না।

সাধারণ কথায় কোন সম্প্রদায় বলতে একই আচার-ব্যবহার, একই রীতি-নীতি এবং উপাসনার লোকদের সমষ্টি বুঝায়। এ থেকে বিচ্যুত হয়ে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজের বা নিজেদের মনমতো বা কল্পিত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও উপাসনার প্রবর্তন বা চালু করলে তাকে সৎ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব থেকে বিচ্ছিন্ন বলে ধরা যায়। এভাবে বিচ্যুত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেই অপ-সম্প্রদায় বলা যায়। এই অপ-সম্প্রদায়ীগণ নিজেদেরকে বৈষ্ণব বলে অনেক স্থানেই পরিচয় দেয়। কখনো বা বৈষ্ণব ধর্মের কিছু রীতিনীতি বাহ্যিকভাবে প্রদর্শন করে। অনেক সময় নিজেদের রচিত শ্লোকের উদ্ধৃতি দেয়, নিজেদের রচিত গান কীর্ত্তন করে ইত্যাদি। এরা হল প্রকৃতপক্ষে ভন্ড। এই কারণে প্রকৃত বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত। এই ধরনের কিছু অপসম্প্রদায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্বে এবং তাঁর আমলেও সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এরা ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্মকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কলঙ্কিত করে। এদের মধ্যে কিছু দুরাচারী এবং ভন্ড শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মতো সম্মান লাভের জন্য নিজেদেরকে ভগবান বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। আবার এদের মধ্যে অনেকে জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করে। ঐ সব কুলাঙ্গারদের মধ্যে কতিপয় হলেন বাসুদেব শিয়াল, বিষ্ণুদাস কপীন্দ্র, মাধব চূড়াধারী প্রমুখ। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের অবতার বলে পরিচয় দিত। শ্রীগৌরচন্দ্রিকা,

প্রেম বিবর্ত্ত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে এরূপ ভন্ডদের বিবরণ আছে। তৎকালীন সময়ে সাধারণ লোকজন অবজ্ঞা এবং ঘৃণা করে এদেরকে শিয়াল, কপীন্দ্র (বানর) ইত্যাদি আখ্যা দেয়।

শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর ১৯০০ সালে রচিত **"বঙ্গে সামাজিকতা"** (বর্ণ ও ধর্ম্মগত সমাজ) বইতে বৈষ্ণব নামধারী বেশ কিছু অপ-সম্প্রদায়ের কথা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন। আমরা এই ক্ষুদ্র বইতে সমাজে প্রচলিত কতিপয় অপ-সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি যাতে প্রকৃত বৈষ্ণবগণ এদের সম্পর্কে জেনে সাবধান থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেন।

২ প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়

২.১ প্রারম্ভিক আলোচনা ঃ যে সব লোক অপ্রাকৃত বা চিন্ময় তত্ত্ব বস্তুকে (পরমেশ্বর ভগবান) জড় প্রাকৃত জ্ঞানের (জড় ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান দ্বারা) সাহায্যে বুঝতে চায় এবং অপ্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করতে চায় বা ব্যবহার করে তারাই হল প্রাকৃত সহজিয়াবাদী। অন্যকথায় যারা প্রাকৃত রাজ্যে (জড় জগতে) অবস্থান করে অপ্রাকৃত (চিন্ময়) বস্তুর (শ্রী ভগবান) ধারণা বা জ্ঞান অর্জনের জন্য ছলনা বা প্রতারণার আশ্রয় নেয় তাদেরকে প্রাকৃত সহজিয়াবাদী বলা যায়।

সহজিয়া সাধন-ভজনের ধারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার অন্যেরা মনে করেন এটি শ্রীচৈতন্য যুগেই সৃষ্টি হয়। এই মতে দেহ-সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ দেহেই রয়েছে পরম-তত্ত্ব (ভগবৎ তত্ত্ব)। প্রত্যেক পুরুষ হল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিরূপ এবং প্রত্যেক নারী হল প্রকৃতি বা শ্রীমতি রাধিকা। এই উভয়ের প্রেমভাব মিলনে যে পরমানন্দ লাভ হয় তাতেই সাধক ও সাধিকা নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন।

এই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা মনে করেন পুরুষ মাত্রেই গুরু হওয়ার যোগ্য। গুরুই শ্রীকৃষ্ণ এবং শিষ্যা হলেন শ্রীমতি রাধিকা। এই উভয়ের

সাধন-ভজনই হল নিত্যলীলা। এদের মতে রস স্বকীয়া এবং পরকীয়া ভেদে দুই প্রকার। এর মধ্যে পরকীয়া রসই শ্রেষ্ঠ। এক্ষেত্রে গুরু নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ রূপে ভাবনা করবে এবং শিষ্যা নিজেকে শ্রীমতি রাধিকা রূপে কল্পনা করবে। এভাবে গুরুর কৃষ্ণ ভাবনা এবং শিষ্যার রাধিকা জ্ঞানই হল আসল ভাবাশ্রয়। এই ভাব থেকেই প্রেম, রস ও রূপের সম্ভোগ হয়। এভাবে শ্রী রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নিত্য লীলাকে আদর্শ জ্ঞান করে জড় বা পার্থিব ইন্দ্রিয় সেবাই হল সহজ সাধন-ভজন।

রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা হল চিন্ময় বা অপ্রাকৃত—অর্থাৎ জড় জাগতিক জ্ঞানের বা কল্পনার উর্ধ্বে। এই লীলা জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত। অথচ এই অপ-সম্প্রদায় একে জড়জাগতিক স্তরে অনুকরণের চেষ্টা করে। এর চেয়ে মহা অপরাধ আর কি হতে পারে? তাছাড়া এরূপ লীলার অভিনয় জড়-স্তরে করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এই অপ-সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু এবং শিষ্যার মধ্যে যৌন-সংসর্গই ঘটে যায় যা মারাত্মক অপরাধ। কারণ **"তুমি রাধা, আমি শ্যাম"**—এই কথা আর থাকে না, তা যৌনতায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

আবার এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের আর একটি রূপ হল নব-রসিক সম্প্রদায়। এরা বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জয়দেব, রূপ গোস্বামী, রায় রামানন্দ প্রমুখ নয়জনকে নব-রসিক ভক্ত মনে করে এবং তাদের সাথে নয়জন প্রকৃতিকে (মহিলা সঙ্গী) আশ্রয় কল্পনা করে স্ব স্ব সাধনে ব্যস্ত থাকে। সোজা কথায় এদের মধ্যে কেউ নিজেকে বিদ্যাপতি, কেউ বা চন্ডীদাস ইত্যাদি মনে করে। প্রত্যেকে একজন করে শিষ্যা নিয়ে সাধনে রত হয়। এরা নিজেদেরকে রসিকজন মনে করে। তাদের মতে এরূপভাবে সাধন-ভজনই যথেষ্ট, শাস্ত্রোক্ত বিধি-বিধান পালনের কোন প্রয়োজন নেই। বৈষ্ণবদেরকে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বৈধী, শুষ্ক, বর্হিমুখী ইত্যাদি বলে অভিহিত করে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বা মত অনুযায়ী জীবের পক্ষে সহজিয়াদের কথিত সাধন-ভজন অসম্ভব এবং অপরাধও বটে। কারণ রাগাত্মিকা রতির সাধন-ভজন সাধারণ জীবের পক্ষে জড়-দেহে কি করে সম্ভব? এই ধরনের সাধন-ভজন কেবলমাত্র ব্রজের গোপীদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের সাধন-ভজন হবে রাগানুগ ধরনের—অর্থাৎ ব্রজের বা বৃন্দাবনের সখীদের অনুগত হয়ে (দাসী হয়ে) রাধাকৃষ্ণের সেবা করা।

এক কথায় সখীর দাসী হয়ে রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবা করা এবং সেই সূত্রে ভাব অনুসারে (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাভাব) রস আস্বাদন করাই জীবের রাগানুগ সাধন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এরূপ শুদ্ধ ও নির্ম্মল সাধন-ভজনে কোন কামভাব নেই; সহজিয়াসাধনে কামভাবই সাধনের ভিত্তি। এই সাধনে তাই অতি সহজেই পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। বাস্তবেও তাই হয়। ফলে সমাজে এদের জন্য ব্যভিচার দেখা দেয়। এই কারণে সহজিয়ারা কোনক্রমেই শুদ্ধ বৈষ্ণব নন।

২.২ সহজিয়া মতবাদের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

একশ্রেণীর সাধারণ লোক মনে করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীধামে অবস্থানকালে যে গম্ভীরা লীলা করেছিলেন তাই বৈষ্ণব নামের সহজিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির মূল কারণ। কিন্তু এই বিশ্বাস একেবারেই ভুল বলা যায়। সহজিয়া মতবাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব থেকেই প্রচার শুরু হয়। কিছু ঐতিহাসিক এবং গবেষক দাবী করেন যে অষ্টম এবং নবম শতকে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের পরম গুরু শ্রী গৌরপাদের চিন্তাধারা থেকেই মূলতঃ সহজিয়া মতবাদের ক্ষীণ ধারা সৃষ্টি হয়। শ্রী গৌরপাদ বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁর **"মান্ডুক্য কারিকা"** গ্রন্থ শঙ্করের বেদান্তবাদের মূল শক্ত করেছে সত্যি, তবে একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শ্রীগৌরপাদের চিন্তাধারা মূলতঃ বৌদ্ধ মহাযানপন্থী ঘেষা ছিল। তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সহজিয়া ছিলেন বলে মনে হয়। এজন্য অনেকে বৈষ্ণব তান্ত্রিকতা ও সহজিয়াভাবের সৃষ্টির (উৎস মূল) কারণ হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিকতাকে দায়ী করেন।

হাজার বছর আগে বাংলাদেশের মধ্যে এক ধরনের তন্ত্র সাধনার উদ্ভব হয়। তারই প্রবাহ এই সহজিয়াবাদ বলে কিছু লোক মনে করেন। এই তন্ত্রসাধনার মন্ত্র এবং গানগুলি আলো-আঁধারী (অনেকটা হেয়ালী ধরনের এবং অনেক ক্ষেত্রে সাংকেতিক ধরনের) ভাষায় রচিত। সাধারণ মানুষ এগুলোর রহস্যময় অর্থ বুঝতে অক্ষম। মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একে **"বৌদ্ধগান ও দোঁহা"** নাম দিয়েছেন। এখন মনে হয় ব্রাহ্মণতন্ত্র এবং বৌদ্ধতন্ত্রের সংমিশ্রণেই সহজিয়া মতবাদের উদ্ভব হয়।

আসলে সহজিয়া ভাবের উৎপত্তি হয় বৌদ্ধতন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়াবাদ থেকে। তৎকালীন ভারতবর্ষের বুকে ব্রাহ্মণ্যবাদের যুক্তিহীন আচার-সর্বস্ব তার্কিকতা ও কুসংস্কার কোটি কোটি নিম্নবর্নের হিন্দুকে ধর্মাচরণ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তখন তারা দলে দলে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। বিশেষ করে তৎকালীন উভয় বঙ্গের সমতল অঞ্চলে মহাযানী বৌদ্ধদের দলবৃদ্ধির মূল কারন ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়। অন্যদিকে বাংলার বুকে তখন মুসলমান শাসকরা এসেছে বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে। তাদের সাথে এসেছেন বহু পীর দরবেশ ও সুফী-সাধক। এঁদের অলৌকিকতায় মুগ্ধ হয়ে ঐ সময় ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক শোষিত ও নিপীড়িত নিম্নবর্ণের বহু হিন্দু ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নেয়। তাদের দেখাদেখি হাজার হাজার বাঙালী বৌদ্ধও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। তার একটি কারণ ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বৌদ্ধদের এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদেরকে প্রচন্ড ঘৃণা করতো। এর মূলে ছিল বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা। কারণ ঐ সময় অনেক বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের অবাধ যৌন সম্পর্ক বাঙ্গালী সমাজ জীবনেও প্রবাহিত হওয়ার উপক্রম হয়। আবার গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় হাজার হাজার বৌদ্ধ-তান্ত্রিক বৈষ্ণব ধর্মের আঙিনায় আসে। কারণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবেশ করেছিল।

এদিকে প্রাক-চৈতন্যযুগে তৎকালীন বাংলার বুকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের লীলাবাদ বেশ ভালমতই প্রচারিত হয়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল শ্রী জয়দেব-এর **শ্রী গীত গোবিন্দম্**। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কঠোরতা ভেদ করে **শ্রী গীতগোবিন্দম্** বাংলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, গোদাবরী নদীর তীর থেকে সুদূর বৃন্দাবন, রাজস্থান পর্যন্ত প্রচার লাভ করে। এমন কি কাশ্মীরেও গীতগোবিন্দের ছায়াপাত পড়েছিল। গীতগোবিন্দের দশ-অবতার স্তোত্রে শ্রীবুদ্ধের নাম থাকাতে মহাযানী বৌদ্ধরা তৎকালীন বৈষ্ণব ধর্মের উদারতায় আকৃষ্ট হয়। তৎকালীন হিন্দুধর্মের তান্ত্রিকতার কঠিন ক্রিয়াকলাপের প্রতি তারা আকৃষ্ট না হয়ে বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ লীলাবাদের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। আর রাধাকৃষ্ণলীলার বিষয়টি তাদের কাছে নিজেদের যৌন তান্ত্রিকতার তুলনীয় মনে হয়ে উঠে। ফলে দলে দলে মহাযানী বৌদ্ধ তৎকালীন সময়ে রাধাকৃষ্ণ লীলাবাদের প্রতি আসক্ত হয়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়। পরবর্তীতে

ধর্মান্তরিত বৌদ্ধদের যৌনতান্ত্রিকতা আরোও পুষ্ট হয় বড়ু চন্ডীদাসের **শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন** গ্রন্থের মাধমে।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন বাংলায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতাবাদ বা বৌদ্ধ সহজিয়াবাদের সঙ্গে হিন্দু তান্ত্রিকতার ঘনিষ্টতা শুরু হয়। এক সময় মহাযানী বৌদ্ধদের চামুন্ডা, বাসুলী, তারা, কালী ইত্যাদি দেবী হিন্দু তন্ত্রে এলেন। আবার নালন্দাসহ কিছু বৌদ্ধ বিহারে দেখা গেল শিব–পার্বতী, বিষ্ণু, গনেশ মুর্ত্তি। এভাবে বৌদ্ধ মহাযানী এবং হিন্দু তান্ত্রিকতার মধ্যে মিলন হল। এর ফলশ্রুতিতেই সহজিয়া মতবাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। চৈতন্য যুগে এসে সহজিয়ারা দেবদেবীর সাধনা ত্যাগ করে দেহস্থিত তত্ত্ব ও যোগ-সাধনাকেই অবলম্বন করলেন। তারা রাধাকৃষ্ণকে প্রকৃতি ও পুরুষভাবে সাধনা করতে আরম্ভ করলেন। হিন্দুতন্ত্রের শক্তিবাদ এবং মহাযানী বৌদ্ধ তন্ত্রের দেহাত্মবাদ-এই দুইয়ের মিলন হল গিয়ে শেষ পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণলীলায়। এই ধারায় দেখা গেল রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলার প্রজ্ঞা লাভ করার বদলে রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ-দৃশ্য-ধ্যান। এই প্রবণতা আরোও বৃদ্ধি পেল জয়দেব–চন্ডীদাস-বিদ্যাপতির কামরসাসিক্ত পদাবলীর মাধ্যমে। এভাবে আরোও গতি পেল দেহভিত্তিক পরকীয়াবাদ।

বৌদ্ধদের কিছু চর্যাপদে পরকীয়াবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই চর্যাপদগুলি মূলতঃ সহজিয়া বৌদ্ধদের দ্বারা রচিত। এই সহজিয়ারা পরপত্নীকেই নায়িকা প্রধান করে সাধন-সঙ্গিনী বলে গ্রহণ করতেন। এটি হল প্রাক-চৈতন্য যুগের কথা। আবার হিন্দু তন্ত্রের শক্তিসাধনায় যে কোন নারীকে (মা ব্যতীত) কুলশক্তি করার অনুমোদন আছে। এভাবে হিন্দুতন্ত্রের শক্তি সাধনা ও বৌদ্ধ সহজিয়ামত মিলিত হয়ে পরবর্তীতে রূপ নিল এক বৃহত্তর পরকীয়াবাদ। অর্থাৎ নির্বিচারে স্ত্রী-সঙ্গী নিয়ে সাধন-ভজন করলেই মহাভাব উপলব্ধি করা যাবে–এই রীতিনীতি বিস্তার লাভ করলো। এই পর্যায়ে এসে বৈষ্ণব নামধারী সহজিয়ারা বললেন পরনারী হল রাধাস্বরূপ। তাই তার সাথে শ্রীকৃষ্ণের মত পরকীয়া প্রেম আস্বাদন করা কোন দোষনীয় নয়। এরপর এল গুরুবাদ। সহজিয়ারা দেখলেন গুরুকে শ্রীকৃষ্ণ এবং শিষ্যাকে রাধারূপে কল্পনা করলেই কেল্লা ফতে! তাহলে আর কষ্ট করে অন্য নারী সম্ভোগের জন্য ছলচাতুরী ও কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে না। শুরু হল গুরুবাদ–ভিত্তিক গুরু-শিষ্যার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা অভিনয়ছলে যৌন সম্ভোগের ধারা।

২.৩ মহাপ্রভু, ষড়গোস্বামী এবং পার্ষদগণ সম্পর্কে সহজিয়াদের ধ্যান-ধারণা

সহজিয়ারা দাবী করেন যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজেও পরকীয়াবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিও স্ত্রী-সঙ্গী অন্তরে কামনা করতেন। মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত বিভিন্ন আচরণ এবং বাহ্যদশা দেখে প্রাকৃত সহজিয়ারা তার নামে দোষারূপ করতে কোন দ্বিধা করেন নাই।

১. প্রথমত ঃ এই অভিযোগ করা হয় যে, পুরীধামে অবস্থানকালে মহাপ্রভুর সাথে এক অল্পবয়সী বিধবা রমনী তার ছোট ছেলেকে নিয়ে প্রায় প্রতিদিন দেখা করতে আসতেন। মহাপ্রভু ছোট ছেলেটিকে আদর এবং স্নেহ করতেন বটে, তবে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিধবা রমণীর সঙ্গলাভ। **শিবচন্দ্র শীল** নামে এক নরাধম সহজিয়া এই ঘটনার বিকৃতরূপ দিয়ে বলেন–

"থাকুক অন্যের কাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।
স্ত্রীমূর্ত্তি স্পর্শন তিহোঁ না করেন কভু॥
বাহ্যেতে প্রকৃতি নিন্দে অন্তরে তন্ময়।
বিধবা ব্রাহ্মণীর সঙ্গে প্রয়োজন হয় ॥"

কি স্পর্ধা দেখুন! প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রভু পিতৃহীন বালককে স্নেহ করতেন মাত্র। তাও আবার ভক্ত দামোদর পন্ডিতের অনুশাসন মেনে নিয়ে ঐ ছেলেটিকেও পরে দর্শন দেন নাই। **(চৈ.চ. অন্ত্য ৩/৩–১৯)**। তদুপরি তিনি দামোদর পন্ডিতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাই বিধবা ব্রাহ্মণীর সঙ্গে মহাপ্রভুর মনে কোন প্রাকৃতভাবের যে প্রকাশ ছিল না এই তার প্রমাণ।

২. দ্বিতীয়ত ঃ সহজিয়ারা বলেন পুরীতে সার্বভৌম পন্ডিতের বাড়ীতে অবস্থানকালে মহাপ্রভু নাকি পন্ডিতের কন্যা ষাটীর সাহচর্য সর্বদা কামনা করতেন। তারা বলেন–

"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাভাগ্যবান।
যার গৃহে শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বানুসন্ধান॥
ষাটিকন্যা ধন্যা সেই ব্রহ্মান্ড ভিতরে।
যাহাতে চৈতন্য চন্দ্র সদায় বিহরে॥"

[উৎসঃ সহজিয়াদের রচিত চৈতন্য প্রেমতত্ত্ব নিরূপণ পুথি ।]

এ সবই মিথ্যা কথা, মিথ্যা অপবাদ। **শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা** থেকে দেখা যায় সার্ব্বভৌম কন্যা ষাটির পতি অমোঘ পন্ডিত মহাপ্রভুর বিপুল ব্যঞ্জনাদি আহারের প্রস্তুতি দেখে নিন্দা করেন। এতে সার্ব্বভৌমের পত্নী ক্রোধে মেয়ের প্রতি অমোঘের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেন। আবার মহাপাতকী পতিকে পরিত্যাগ করার জন্যও ষাটীকে পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু পাষন্ডী সহজিয়ারা এত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। তারা যুক্তি দেন খাওয়ার ব্যাপারে মহাপ্রভুকে অমোঘ পন্ডিত যে নিন্দা করেন তার মধ্যে কিছু রহস্য আছে। মনে হয় ষাটীর সাথে মহাপ্রভুর সম্পর্ক ছিল। তাই অমোঘ খাদ্যখাদ্যাদি ব্যাপারে মহাপ্রভুর নিন্দা করে তাঁকে সার্ব্বভৌম পন্ডিতের বাসস্থান থেকে দূরে চলে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল। কি জঘন্য অপবাদ মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে! অথচ **শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত** থেকেই দেখা যায় মহাবৈষ্ণব অপরাধ করায় অমোঘ পন্ডিতের বিসূচিকা (কলেরা) হলে মহাপ্রভুই তাকে কৃপাবশত সুস্থ করে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন। তাই সহজিয়াদের উপরোক্ত ধ্যান-ধারণা যে জঘন্য মিথ্যা তা বলাই বাহুল্য।

৩. তৃতীয়ত ঃ সহজিয়ারা বলেন মহাপ্রভু স্ত্রী-সঙ্গ কামনা করতেন। তা না হলে তিনি পুরীতে দেবদাসীদের গান শুনে তাদের অনুসরণ করেছিলেন কেন? তাও আবার জয়দেবের গীতগোবিন্দের গান যা রসলীলায় ভরপুর। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ বিষয়ে **শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের** উদ্ধৃতি দেন–

"একদিন প্রভু যমেশ্বর -টোটা যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে॥
গুজ্জরী রাগিনী লঞা সুমধুর-স্বরে।
গীতগোবিন্দ পদ গায় জগমন হরে॥
দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী, পুরুষ, কে গায়,–না জানি বিশেষ॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে সিজের বাড়ী হয়, ফুটিয়া চলিলা॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ১৩/৭৮–৮১)।

উপরোক্ত শ্লোকগুলির বিকৃত অর্থ করে সহজিয়ারা বলেন যে, অঙ্গে কাঁটা লাগা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে দেবদাসীদের সাথে মিলিত হবার জন্য মহাপ্রভু

তাদের পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন। এটিও জঘন্য মিথ্যাচার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্ত্রী, পুরুষ, এবং কে গায় তা না দেখেই কিন্তু গানের সুমধুর স্বরে আকৃষ্ট হয়ে আবেশভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন। গান দেবদাসীরা গেয়েছিল কিনা তা তিনি মোটেই জানতেন না। জানলে অবশ্যই অগ্রসর হতেন না। কারণ তিনি সব সময়ই স্ত্রী-সঙ্গ বর্জন করতেন এবং তার কোন ভক্ত স্ত্রী-সঙ্গ করুক তাও পছন্দ করতেন না। **শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের** একই অধ্যায়ে আছে ভক্ত গোবিন্দ যখন তাঁকে এই গান স্ত্রীলোকে গাইছে বলে জানান তখন তিনি ফিরে আসেন এবং গোবিন্দ তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

"ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
স্ত্রীগান বলি গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে॥
স্ত্রী-নাম শুনি প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা ॥
প্রভু কহে—গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ১৩/৮৩–৮৫)।

এই শেষের শ্লোকগুলির কথা কিন্তু সহজিয়ারা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন না। তারা এগুলো সযত্নে এড়িয়ে যান। কারণ মহাপ্রভুকে যেনতেন ভাবে নিজেদের দলে টানা চাই। তা হলেই বৈষ্ণব ধর্মের মুখোশ পড়ে অনাচার করার বৈধতা পাওয়া যাবে।

৪. চতুর্থত ঃ সহজিয়ারা যুক্তি দেন মহাপ্রভুর এক তনু দুই ভাব। তিনি মূলতঃ পরকীয়াবাদী ছিলেন। তারা **শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত** গ্রন্থের নিম্নোক্ত শ্লোকের প্রসঙ্গ এই পর্যায়ে এনে উপস্থাপন করেন।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য–গোসাঞি ব্রজেন্দ্র কুমার।
রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥"

(চৈ. চ. আদি ৪/২২২–২২৩)।

তারা আরো বলেন মহাপ্রভু গম্ভীরা লীলায় পরকীয়াভাবে রাধাকৃষ্ণের মিলন সুখ আস্বাদন করতেন। কিন্তু এ সবই ভুল এবং বিকৃত ব্যাখ্যা। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধার পরকীয়া তত্ত্বকে ভক্তি-প্রেমসহকারে মেনে নিয়ে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের আরাধনা করতেন। আর মহাপ্রভুর পক্ষে যা সম্ভব অপরের পক্ষে তা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি রাধাভাব নিয়ে এসেও যুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করেন এবং তাঁর অবতারের এই ছিল মূল কারণ। তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পাই-

"সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার॥
সেইভাবে নিজবাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ ॥"

(চৈ. চ. আদি ৪/২২০-২২১)।

কিন্তু নারীসঙ্গী সহজিয়ারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে গোলেকের প্রেমধন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র দ্বারা জীব উদ্ধারের জন্য মূলতঃ নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তা চাতুরী পূর্বক ভুলেও উচ্চারণ করেন না। তারা কেবল খুঁজে বেড়ান মহাপ্রভুর পরকীয়াবাদ।

৫.পঞ্চমত ঃ সহজিয়ারা দাবী করেন যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং জয়দেবের পদ শুনতে পছন্দ করতেন তাই তিনিও পরকীয়াবাদী ছিলেন। কারণ এরা ছিলেন নবরসিক-অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় এরা প্রচুর যৌনরসের সৃষ্টি করেছেন। তাই তাদের গান শুনা মানে মহাপ্রভুও রাধাকৃষ্ণের লীলা শুনার অভিনয়চ্ছলে যৌনরস আস্বাদন করতেন। কি সাংঘাতিক অপবাদ!

সহজিয়ারা আরো বলেন মহাপ্রভু নাকি বড়ু চন্ডীদাসের **বংশীখন্ড** শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতেন। বংশী ও বংশীধ্বনীর কোন গূঢ় রহস্য কোন বৈষ্ণব মহাজন ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু সহজিয়াদের কাছে এর গুপ্ত রহস্য আছে। তাদের মতে বংশী হল কাম-এর চিহ্ন আর বংশীধ্বনি রতিশীৎকার (অর্থাৎ সম্ভোগের সময় নারী মনো-দৈহিক সুখ উপভোগ করে যে ধরনের ধ্বনি প্রকাশ করে)। রাধাকর্তৃক বংশী হরণ করা হলে শ্রীকৃষ্ণ যে ব্যাকুল হন তার কারণ হিসাবে সহজিয়ারা বলেন হ্লাদিনী শক্তি পুরুষের কাছ থেকে তাঁরই

প্রদত্ত কাম শক্তি হরণ করে তাঁকে শক্তিহীন করেন। বংশীবাদক কানাই বৃন্দাবনের যমুনার তীরে কদম্বতরুর ডালে বসে বেনু বাজান। বেনুর সুললিত সুরে শ্রীমতি রাধাসহ ষোলশত গোপিনী রতিরস তাড়নায় উন্মাদিনী হতেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ এসে তাদের যৌনকামনা পুরণ করতেন। তারা যুক্তি দেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই বাঁশীর সুর শুনবার জন্য ব্যাকুল হতেন। ফলে তিনি পরকীয়া রস আস্বাদন করতে ভালবাসতেন বলা যায়। এটিও এক ধরনের অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাপ্রভু গোপীভাবে সাধনা করতেন। জড়ীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সেটিকে দেখলে চলবে না কোনক্রমেই।

সহজিয়াদের দৃঢ় বিশ্বাস মহাপ্রভু নীলাচলে–অর্থাৎ পুরীতে গম্ভীরায় থেকে নিজেকে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন ধরনের লীলা রস আস্বাদন করতেন। কিন্তু সেটি বাহ্যিক না হয়ে আত্মিকরূপে করতেন। কারণ তিনি তখন রাধা ও গোপীভাবে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের বিরহ দশায় উপনীত হতেন।

"কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশদশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ১৪/৫২)।

শ্রীরাধা বা গোপীদের ভাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করা অতি গূঢ় বিষয়। এর জন্য দরকার দেহ ও মনের প্রস্তুতি। সিদ্ধ ও নিত্যদেহী ব্যতীত কারো পক্ষেই এভাবে ভজনা করা সম্ভব নয়। মহাপ্রভু সেই ভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করে তারপর রাধাভাবে কৃষ্ণবক্ষে ঝাঁপ দিতে পেরেছিলেন। কারণ শৃঙ্গার রসের সাধনা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। পদে পদে পদস্থলনের ভয়। তাছাড়া সাধারণ নরনারীর যৌনসুখ এ-নয়। এই কঠোর দেহমন গঠন করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের পদাবলীর রস রাসাত্মিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এজন্য **শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে** বলা হয়েছে–

"প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ, যদ্যপি হয় ধীর।
বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে?
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥"

একথা সত্য যে পুরীতে অবস্থানকালে মহাপ্রভু তার গম্ভীরা লীলার সময় কখনো রাধাভাব এবং কখনো গোপীভাবে তন্ময় হয়ে থাকতেন। সে সময় মাঝে মাঝে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উন্মাদের মতো প্রলাপ করতেন। তার এই ভাবকেই সহজিয়ারা বিকৃতভাবে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করে। তারা বলেন তিঁনি (মহাপ্রভু) শক্তি (প্রকৃতি) নিয়ে সাধনা করতেন। কিন্তু মহাপ্রভু পারতপক্ষে নারীমুখ দর্শন করতেন না। এমনকি নারীদেরকে তাঁর কাছে এসে প্রনাম করতে দিতেন না। ভক্তগণের স্ত্রীরা দূর থেকেই প্রভুকে দর্শন করতে পারতেন মাত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত শিবানন্দ সেন পুত্র-পরিজন এবং নবদ্বীপের অপরাপর ভক্তগণসহ প্রতি বছর পুরীতে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য আসতেন। সে সময়ও মহাপ্রভু কোন স্ত্রীলোককে তার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিতেন না। দূর থেকেই তারা প্রভুকে দর্শন করতে পারতেন। **শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে** এর বর্ণনা আছে–

"পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ১২/৪২)।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সহজিয়াদের মতো বিষয়ীও ছিলেন না। তাঁর এক ভক্ত ছোট হরিদাস তাঁকে প্রতিদিন কীর্ত্তন করে শুনাতেন। হরিদাস মহাপ্রভুর খুবই স্নেহাস্পদ ছিলেন। তার কণ্ঠে কীর্ত্তন শুনে মহাপ্রভু খুবই সন্তোষ লাভ করতেন। সেই হরিদাস একদিন শিখি মাহিতীর বোন বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবী দেবীর কাছ থেকে প্রভুর সেবার জন্য কিছু উত্তম চাল চেয়ে আনেন। মহাপ্রভু তা অবগত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন।

"প্রভু কহে,–বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পাঁরো আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার-ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।"

(চৈ. চ. অন্ত ২/১১৭-১১৮)।

প্রাকৃত সহজিয়ারা হলেন মর্কট বৈরাগী। অর্থাৎ উপরে কৃত্রিম বৈষ্ণবের বেশ, অথচ ভিতরে বানরের মন– অর্থাৎ কৈতব মন। এরা ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং

প্রকৃতি বা স্ত্রী-সঙ্গী। প্রকৃতি সম্ভাষনেই এরা বেশী আনন্দ পায়। মহাপ্রভুর ভাষায় বলা যায়–

"ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট–বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ২/১২০)।

এই আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা **শ্রী জ্ঞানদাসের** নিম্নোক্ত পদাবলী দিয়েই মহাপ্রভুর প্রকৃত রূপ তুলে ধরছি ঃ

"প্রকৃতির ভাবে বিভাবিতে দেহ
ভিতর প্রকৃতি নয়॥
বাহিরে দেখিছ পরের রমণী
না চাহে নয়ানকোণে
অন্তরে উহার পরান-কান্দিছে
শুধু পরনারী গুণে ॥
রমণীর অঙ্গ লইয়া দেহ
ভাবের তরঙ্গে ভাসে।
পাগলের প্রায় ইতি উতি ধায়
কান্দিয়া কান্দিয়া হাসে ॥
আপনে পাগল বলে হরি বোল
লোকেরে পাগল করে।
কি পুরুষ নারী পাছু না বিচারি
পাগল হইয়া মরে॥
জ্ঞানদাসে কয় ভাবের তরঙ্গ
ভাব কে বুঝিতে পারে।
চৈতন্য ভাবের ভাবুক নহিলে
আনে কি বুঝিতে পারে॥"

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময় থেকেই কিছু বৈষ্ণব নামধারী ব্যক্তি গোপনে নারী সঙ্গ নিয়ে মেতে উঠেছিলো। এই অবস্থা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চোখ এড়িয়ে যায়নি।

মাধুর্যময় শ্রীচৈতন্যের গোপীভাব তত্ত্ব সাধারণ লোক পবিত্রভাবে নিতে পারবে না-তা কেবলমাত্র ঐ সময় তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ এই **"মহাভাব"**-এর মানুষকে বাস্তবে কাম-মোহ ও লালসাহীন হতে হবে। এর জন্য চাই ভক্তিযোগ সাধন। কয়জন লোক এই সাধন করতে পারবে? এজন্যই তিনি তরজার আকারে সাংকেতিক ভাষায় মহাপ্রভুকে এক পত্র প্রেরণ করেছিলেন যে তার প্রেম-ধর্ম পূর্ণাঙ্গতা রূপ-লাভ করেছে। এখন আর তাঁকে কোন চিন্তা করতে হবে না।

শ্রী চৈতন্য উত্তর যুগে বৈষ্ণব-তান্ত্রিকতা ব্যাপকভাবে তৎকালীন বঙ্গদেশ ছাড়াও উড়িষ্যা এবং বৃন্দাবনে ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রমাণ সহজিয়াদের প্রণীত কিছু অপ্রামানিক পুথি থেকে পাওয়া যায়। এই সব পুথিতে ষড় গোস্বামী ও রায় রামানন্দ সহ অপরাপর বৈষ্ণব মহাজনরা যে প্রকৃতি (স্ত্রী) সঙ্গী ছিলেন তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বর্ণনা রয়েছে। যেমন **অকিঞ্চন দাস** নামে এক পাষন্ডী সহজিয়ার লেখা পুথিতে পাওয়া যায়-

"শ্রীরূপ করিলা সাধনা মীরার সহিতে।
ভট্ট রঘুনাথ কৈলা করণ-বাই সাথে ॥
লক্ষহীরা সনে করিলা গোস্বামী সনাতন।
মহামন্ত্র প্রেমসেবা সদা আচরণ ॥
গোঁসাই লোকনাথ চন্ডালিনী কন্যাসঙ্গে।
দোঁহা ভাসে অনুরাগ প্রেমের তরঙ্গে॥
গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে ব্রজদেবী সমা।
গোঁসাঞি কৃষ্ণদাস সদাই আচরনা॥
শ্যামা নাপিতানির সঙ্গে শ্রীজীব গোসাঞি।
পরম সে ভাব কহিতে যার সীমা নাই॥
রঘুনাথ গোস্বামী প্রীতি উল্লাস।
মীরাবাই সঙ্গে তেঁহ রাধাকুন্ডে বসে ॥
গৌর প্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোসাঞি।
করয়ে সাধন অন্য কিছু নয়॥
রায় রামানন্দ যজে দেবকন্যা সঙ্গে।
আরোপেতে স্থিতি তেঁই ক্রিয়ার তরঙ্গে॥"

– অর্থাৎ মূঢ় **অকিঞ্চন দাসের** মতে মহাপ্রভুর পরিকররাও প্রকৃতি (স্ত্রী সঙ্গী) নিয়ে সাধন-ভজন করতেন। আবার **কাঙ্গাল প্রেমচাঁদ বাউল** নামে এক পাষণ্ডী ও লম্পট আরো নগ্নভাবে গোস্বামীদের সাধন-ভজন সম্পর্ক কটাক্ষ করেন–

"শ্রীরূপ দেখ প্রকৃতি সঙ্গ।
মীরাবাই নামে তার প্রেমের তরঙ্গ॥
রূপগোঁসাই যবে মধুগিরিতে গমন।
সেইকালে মীরাবাই করিল যতন॥
যতন করি সনাতন হীরাবাইকে দিল মন
পুষ্প অন্বেষণে যে ঘটিল।
হীরাবাই দিল ডঙ্কা ঘুচিল মনের শঙ্কা
সনাতন প্রেমেতে ডুবিল॥
শ্রীভট্ট রঘুনাথ কোনো রায়ের সাথ
প্রেম পিরিতি যে কেলি।
যে যার পিরিতি করে দিবা রাতি
অনুরাগে রসয়লী॥
শ্রীজীবের প্রেমখানি শ্যামা নাপিতানী
কতই পিরিতি পশী।
আহামরি ভাব ভাবেতে যে লাজ
উদয় হইল শশী॥
গোপাল ভট্ট প্রেম তনু করে হেম
গোরা প্রিয়া নামে দাসী।
অতি যতনে করি প্রেমের পোশারি
পিরিতি রসেতে খুশী॥
দাস রঘুনাথ করে আওসাত
কিরাবাই নামে সতি।
আছে ভাবের লতা রস তাহে গাঁথা
সকলি উঠিল মাতি॥
এই ছয় তত্ত্ব পায় যে পদার্থ

সেইজন হবে পার।
এই ছয় ধর্ম্ম, গোস্বামীর মর্ম্ম
যে যাহা বুঝয়ে তার।"

এক্ষেত্রে উপরোক্ত পদগুলিতে যে সব সাংকেতিক শব্দ আছে সেগুলো সবই নোংরা এবং যৌনাত্মক। বুঝার সুবিধার্থে নীচে তার অতি সংক্ষিপ্ত অর্থ দেখানো হল (পাঠক-পাঠিকারা আমাকে ক্ষমা করবেন) ঃ

সঙ্গ = দেহমিলন।

তরঙ্গ = দুই বিপরীত রসের মিলন।

যতন = সম্ভোগ বা যৌন মিলনের আহ্বান।

পুষ্প = ঋতু, যোনি পীঠ।

ডঙ্কা = আকর্ষণ বা আহ্বান করা।

রসয়লী = রতি ক্রীড়া বা সম্ভোগে নিয়োজিত হওয়া।

শশী = পুরুষের বীর্য।

আওসাত = রতিবিহার, বা নারীর সাথে সংঙ্গমে লিপ্ত হওয়া।

লতা = পুরুষের লিঙ্গ ও নারীর যোনি।

ছয়তত্ত্ব = আকর্ষণ, চুম্বন, লেহন, মর্দন, রতিক্রিয়া ও বীর্যপাত।

প্রাকৃত সহজিয়াদের উপরোক্ত ছয়তত্ত্বের সাথে তান্ত্রিক-বৌদ্ধদের ছয়তত্ত্বের নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মতই সহজিয়াদের সাধন-ভজন ক্রিয়াকলাপ সংগোপনে হয়ে থাকে।

**"অধর-মর্দন—স্পর্শন
রস-রতি-মিলন ॥"**

সহজিয়াদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলেন বৃন্দাবনের রাধাকুঞ্জের তীরে বসে ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরাধার বিরহ যন্ত্রণা আস্বাদন করতে করতে অশ্রুপ্লাবিত নয়নে সবকিছু ঝাপসা দেখতেন।

এমনকি তিনি জ্ঞানহারা পর্যন্ত হতেন। তাদের মতে এই বিরহ যন্ত্রণার স্বাদ লাঘব করবার জন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী **"দানকেলি কৌমুদি"** নামক সরস হাস্যসিক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণের পাশা খেলায় সখীদের সামনে পণ—রাখা হয় যদি শ্রীরাধা জিতেন তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী নিয়ে যাবেন। আর শ্রীকৃষ্ণ জিতলে রাধার অধরের সহস্র চুম্বন লাভ করবেন। সহজিয়াদের

মধ্যে কেউ কেউ বলেন রাধা পরাজিত হলে তিনি কৃষ্ণকে কোলে নেবেন। সহজিয়ারা এই কথার মধ্যে বিপরীত রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করেন।

প্রাকৃত সহজিয়ারা ষড়গোস্বামী, রায় রামানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজন সম্পর্কে উপরোক্ত উপায়ে যে সব অদ্ভুত বিবরণ নিজেদের পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করেন সেগুলোর কোন প্রমাণ বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় না। আর পাওয়া যাবেই বা কি করে? এসব বৈষ্ণব মহাজনরা তো রাগানুগা ভক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা নিজেরাও রাগাত্মিকা সাধন-ভজনের কথা প্রচার করেন নাই। রায় রামানন্দ শ্রী জগন্নাথ দেবের দেবদাসীদেরকে নিজের হাতে গাত্র সমার্জন, স্নান, ও বস্ত্র পরিয়ে নিজের লিখিত নাটক ও গীত শিখান-একথা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আছে। কিন্তু এসব কাজেও তাঁর কোন কামবেগ হয় না। নির্ব্বিকারভাবে এসব কাজ করেন। একজন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষেই কেবলমাত্র এরূপ করা সম্ভব। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায়-

"দুই দেব-কন্যা হয় পরম সুন্দরী।
নৃত্য-গীতে সুনিপুণা, বয়সে কিশোরী॥
সেই দুঁহে লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ-নাটক-গীতের শিখায় নর্ত্তনে।
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান, গাত্র সংমার্জ্জন।

(চৈ. চ. অন্ত্য ৫/১৩-১৪; ১৬-১৭)।

কিন্তু বিকৃত রুচির প্রাকৃত সহজিয়ারা রায় রামানন্দের উপরোক্ত কাজের মধ্যে প্রকৃতি-সাধনার তথা বাহ্যিকভাবে যৌন-রস আস্বাদনের কদর্য গন্ধ খুঁজে পান। অথচ পরবর্তী শ্লোকগুলো তারা কিন্তু উচ্চারণ করতে চান না-

"স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মন্ডন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন ॥
কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুনী স্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব॥
সেব্য-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসী ভাব করেন আরোপণ॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ৫/১৮-২০)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু রায় রামানন্দের উপরোক্ত বাহ্যিক কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর ভক্তদেরকে এভাবেই শিক্ষা দেন যে আপাত দৃষ্টিতে প্রকৃতি-সঙ্গী মনে হলেও কোন নিত্যসিদ্ধ মহাজনের কার্যকলাপ অপ্রাকৃত স্তরেই থেকে যায়, জড়ীয় দৃষ্টিতে তার বিচার চলে না। এজন্যই প্রদ্যুন্ম মিশ্র নামের এক ভক্ত তাঁর কাছে কৃষ্ণকথা শোনার বাসনা ব্যক্ত করলে তিনি তাকে রায় রামানন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আর প্রদ্যুন্ম মিশ্র রামানন্দের সাথে দেখা করতে গেলে তার (রামানন্দের) সেবকের কাছে জানতে পারেন যে রামানন্দ দেবদাসীদের পরিচর্যায় নিয়োজিত আছেন। পরে রামানন্দের সাথে সাক্ষাত হলেও তিনি তাঁর কাছে কৃষ্ণ কথা না শুনে মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে এসব খবর জানালে তিঁনি উত্তর দেন এভাবে–

"আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি মানি।
দর্শন-রহু দূরে, প্রকৃতি নাম যদি শুনি॥
তবহিঁ বিকার পায় মোর–তনু-মন।
প্রকতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?॥
রাগানুগ-মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ–তুল্য, তাতে প্রাকৃত নহে মন॥"

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় তিনি যেমন প্রকৃতি–সঙ্গী ছিলেন না, তেমনি রাগানুগ-মার্গে ভজনকারী ষড়গোস্বামী সহ কোন বৈষ্ণব মহাজনই প্রকৃতি-সঙ্গী কামনা করতেন না। এদের দেহ-মন ছিল কাষ্ঠ এবং পাষানের সমতূল্য–অর্থাৎ সর্বতোভাবে নির্ব্বিকার। তাই মহাপ্রভু সহ তাঁর পার্ষদ ও ভক্তগণের সম্পর্কে সহজিয়াদের মিথ্যা ও ধৃষ্টতাপূর্ণ অপপ্রচার সর্বতোভাবে মিথ্যা বলা যায়। এরা তাই অসৎ এবং কৃষ্ণের অভক্ত।

২.৪ সহজিয়াদের দেহকেন্দ্রিক সাধন-ভজনের উৎস এবং পদ্ধতি

প্রাক-চৈতন্যযুগে (অর্থাৎ মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী সময়) শ্রী জয়দেবের **"শ্রীগীত গোবিন্দম"** গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লীলার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাকেই অনেকে প্রাকৃত সহজিয়াদের সাধনার মূল প্রেরণা/উৎস বলে মনে করেন। তাদের কাছে গীতগোবিন্দের ললিত প্রেম-তরঙ্গ যেন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম স্থান।

লীলাশুক বিল্বমঙ্গল তার **শ্রী কৃষ্ণ কর্ণামৃত** বইতে সখীভাবে যে রূপে রাধাকৃষ্ণের সেবা করেছেন, জয়দেব তা করেন নাই বলা যায়। তাই জয়দেব-এর স্থান সহজিয়াদের কাছে অতি উচ্চে। সহজিয়াদের তথাকথিত সহজ সাধন-ভজনের সারনি-স্বরূপ হল গীতগোবিন্দম্। তাদের দেহকেন্দ্রিক সাধনার সফল শস্য এই গ্রন্থ—এতে কোন সন্দেহ নেই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ কামচর্চার প্রাঙ্গন। তাই প্রাকৃত ভাবে সাধন-ভজনে অভিলাষী কিছু সহজিয়ার কাছে জয়দেব হলেন নব-রসিকদের একজন।

এরপর হল বড়ু চন্ডীদাসের **শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন** কাব্য। এই কাব্যের রাধা অতি সাধারন গোয়ালিনী বধু। এখানে বৈষ্ণবদের অপরাপর গ্রন্থের মতো রাজ-ঐশ্বর্য-শীলা নন। একেবারে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব-সহজিয়াদের মনের মতো বর্ণিতা তিনি। শ্রীরাধা প্রতিদিন সখী-গোপীদের সাথে মথুরায় দুধ, দৈ, ক্ষীর বেচতে যান। এখানেও তার রাজকীয় মহিমা প্রকাশ পায় নাই। বড়াই কর্তৃক রাধার যে রূপের বর্ণনা এই কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় তাও নিছক গ্রাম্যরস অতিক্রম করতে পারেনি। এই কাব্যগ্রন্থটি এক অর্থে পুরাপুরি দেহাত্মিক। তাই এক সময় বৈষ্ণবতান্ত্রিক তথা একশ্রেণীর সহজিয়াদের দ্বারা যে এটি গীত হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ রাধার দেহ সম্ভোগ করবার জন্য কৃষ্ণের যে আকুলতা ও ব্যাকুলতা এই কাব্যে বর্ণিত তা যে দেহকেন্দ্রিক সহজিয়াদের কাছে ভাল লাগবে—এ কথা বলাই বাহুল্য।

আবার শুধু শ্রী চন্ডীদাসের (ইনি বড়ু চন্ডীদাস নন) পদাবলীর মধ্যে কিছু সহজিয়াভাবের মাল-মশলা আছে বলে কেউ কেউ দাবী করেন। সহজিয়াদের মধ্যে কিছু লোক তাদের প্রয়োজনে চন্ডীদাসের কিছু পদাবলীর উদ্ধৃতি দিয়েও দেহকেন্দ্রিক সাধন ভজনের পক্ষে কথা বলেন। তবে শ্রী চন্ডীদাসের পদাবলীতে মূলতঃ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-মাধুর্যতা বন্যার দূরন্ত নদীর বেগের মতো, তীব্রদেহ কাম-পীড়িতা নয়। অতি ধীরে ধীরে সেই প্রেম মন থেকে দেহে উপছে উঠেছে এক অনাবিল পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু **শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন**-এ বর্ণিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে মনে হয় বালিকাবধু রাধাকে সম্ভোগের জন্য অতি ব্যাকুল। এর মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের বীরাচার বা বামাচার পদ্ধতির ইঙ্গিত মিলে। কারণ হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে এমন কিছু তন্ত্র আছে যেখানে প্রয়োজনে যে কোন নারীকে কূলশক্তি (সাধন ভজনের প্রাকৃত মাধ্যম বা

উপায়) করবার জন্য বল প্রয়োগ করা হলেও তা দূষণীয় নয়। **শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন** কাব্যে দেখানো হয়েছে আয়ান বধু রাধা প্রথমে সমাজ ও লোক নিন্দার ভয়ে কৃষ্ণের সাথে গোপনে প্রেম করতে চায়নি। পরে বড়াইয়ের প্ররোচনা এবং কৃষ্ণের চালাকি ও বাহুবলের কাছে তাকে আত্মসর্পণ করতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য বড়ু চন্ডীদাস লিখেছেন কিছুটা যাত্রার ঢঙ্গে। এখানে শ্রীরাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের উক্তিই বেশি। প্রকৃতপক্ষে যারা রাধাকৃষ্ণের পদাবলী রচনা করেছেন তাঁরা সবাই শ্রীরাধাকে নানা বিশেষণে ভুষিত করে রাজনন্দিনী বলেছেন। কিন্তু **শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন** এর বড়ু চন্ডীদাস তার রাধাকৃষ্ণকে এভাবে উপস্থাপন করেন-নি। তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলাকে দেখিয়েছেন নিছক দেহভিত্তিক গ্রাম্য যুবক-যুবতীর পরকীয়া প্রেম রূপে। এর রস হল দেহকেন্দ্রিক তন্ত্র-সম্মত।

শ্রীগীতগোবিন্দের চরম আদি রসাত্মক পদ এবং বড়ু চন্ডীদাসের **শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের** নগ্ন শৃঙ্গার রসাত্মক পদের মধ্যে খুব একটা ভেদ নেই। অন্যদিকে বিচিত্র রকমের ভাষা-শব্দ-ছন্দ দ্বারা বিদ্যাপতির পদাবলী রচিত হলেও তার মধ্যে শ্রী চন্ডীদাসের সেই সহজ সরল ভাষায় রচিত রসাত্মক পদাবলীর আধ্যাত্মিক রহস্য নেই। **শ্রী গীতগোবিন্দে** জয়দেব দশ অবতারের স্তোত্রে বুদ্ধাবতারও অন্তর্ভুক্ত করেছেন, বিদ্যাপতি শৈব-পদাবলী রচনা করেছেন, এবং বড়ু চন্ডীদাস বাসুলী দেবীর আশ্রয় নেন। এভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় ঘটে। আর এর আলোকে একদল বৈষ্ণব নামধারী ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্মেও তন্ত্রসাধনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আর তখন থেকেই বৈষ্ণব তন্ত্রে শ্রীরাধাকেই সাধনার দেবী হিসাবে এরা গ্রহণ করে নেন যা একেবারেই গর্হিত, অবৈধ, অন্যায় এবং মহা অপরাধ।

কিছু বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে রাধা বিবাহিতা। কিন্তু তিনি জননী নন এবং একাধিক পুরান শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি আয়ান বা অভিমন্যুর পত্নী। আবার শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ কখনো পরবধুর সাথে প্রেমালাপ করেন নি।*

---

* আবার কিছু বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণও পরকীয়া প্রেমে মত্ত রাধার সঙ্গে। সহজিয়ারা কিন্তু কিছুতেই শ্রী রাধাকে কৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী নন।

[শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত "বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব' নাটক দ্রষ্টব্য ।]

শ্রীমদ্ ভাগবতে সরাসরি রাধার কথা নেই, তবে প্রধানা গোপীর কথা রয়েছে। বৈষ্ণবরা তাঁকেই শ্রীমতি রাধিকা হিসাবে মনে করেন। এখানেও প্রধানা গোপীকে কৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী বলা হয়নি এবং তিঁনি রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সাথে পরকীয়া প্রেম আস্বাদন করেন। প্রাকৃত সহজিয়ারা তাই বলেন সাধন-ভজনের পথে রাধাকে কুল শক্তির প্রতিভু বা প্রতীক রূপে বিবেচনা করা যায়। এই মনোভাব একেবারেই জঘন্য।

বৈষ্ণব নামের সহজিয়াপন্থীরা জয়দেবের গীতগোবিন্দম্-এ বর্ণিত রাধাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেন। তারা বলেন, গীত গোবিন্দম্ গ্রন্থের পরই বৈষ্ণব ধর্ম একটি নুতন পথের সন্ধান পায়। প্রকৃতপক্ষে জয়দেবের শ্রী গীতগোবিন্দম্-এর মধ্যে দেহাত্মিক ও রসাত্মিক দুইভাবই বিরাজমান। আর বৈষ্ণব সহজিয়ারা এর দেহাত্মিক দিকটাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ প্রকৃত পক্ষে রাধা অঙ্গ কৃষ্ণময়। আর কৃষ্ণতনু রাধাময়।

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ শক্তি -হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী-দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৫৯-৬০)।

কিন্তু সহজিয়াদের ধ্যানধারনা অন্যরূপ নিয়েছে। তাদের কাছে রাধাকৃষ্ণের এই লীলার মধ্যে যৌন তান্ত্রিকতার গন্ধ আছে। তারা রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমকে পার্থিব বা জড় স্তরে আনতে অভিলাষী। এই ভাবে তারা রাধকৃষ্ণের লীলায় যৌন-তান্ত্রিকতার সংকেত রয়েছে বলে যুক্তি দিয়ে দেহাত্মিক প্রেম-সম্ভোগ সাধনে ব্রতী হন। বিদ্যাপতির রাধার নিম্নোক্ত উক্তিকেও সহজিয়ারা তাদের সাধন-ভজনের ভিত্তি বলে প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করেন–

"তোহেঁ পর নাগর হাম পর নারি।"

আর শ্রী চন্ডীদাসের রাধা অনুযোগ করছেন–

"সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরায়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥"

এছাড়া প্রাক-চৈতন্য যুগে বহু জানা-অজানা কবিদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক শ্লোকে অবৈধ প্রাকৃত যৌন প্রভাব বর্তমান এবং সেখানে রাধাকৃষ্ণের তথাকথিত পরকীয়া ব্যভিচার বৃত্তিকেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর এসব শ্লোকই সহজিয়াদেরকে তান্ত্রিক ভজন-সাধনে অনেকটা উদ্বুদ্ধ করেছে বলা যায়।

সাধারণত বলা হয় রতিভাব না এলে সাধক কোনদিন সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। বৈষ্ণব–সহজিয়াগণ এই রতিভাবের উপর দৃঢ়তা অর্পণ করেন। এই রতিভাবকে তারা প্রকৃতি-পুরুষের দৈহিক মিলনের মধ্যে খুজে পান। কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী এরূপ মিলন কোনমতেই শুদ্ধরতি আখ্যা লাভ করতে পারে না।

বৈষ্ণব নামের সহজিয়াদের কাছে **"মদন-মাদন ভাব"** খুবই উচ্চশ্রেণীর রসের সাধনা। তাই সহজিয়া **পঞ্চানন দাসের** পুঁথিতে দেখা যায় –

"গুণে বানে হয় রসিকের করণ।
পঞ্চবানেতে তাঁহারা করেন সাধন।"

সহজিয়াদের **রত্নসার** গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে–

"মদন মাদন আর শোষণ স্তম্ভন।
সম্মোহন আদি করি রসিক-করণ।"

বৈষ্ণব নামের সহজিয়াদের একপদে বলা হয়েছে যে **"প্রকৃতি-পুরুষ মিলন লীলায়"** দেহ ও মনের প্রবৃত্তির উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ দেহ ও মনের সুনিপুণ ও সর্বাঙ্গীন মিলনের মাধ্যমে উভয় শক্তির সাম্যরস সৃষ্টি হয় এবং এভাবে মিলন না হলে সাধনায় প্রকৃত সিদ্ধি লাভ হবে না। এর জন্য কিছু সহজিয়া বিন্দু সাধনের পক্ষপাতী। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের সময় সম্ভোগ সুখ লাভ করাই বড় কথা, বীর্যপাত নয়। তাই বিন্দু সাধনার জন্য গুরুর আশ্রয় নিতে হবে। তিনি শিখিয়ে দেবেন কিভাবে কুম্ভক, পূরক ও রেচকের সাহায্যে ইড়া-পিঙ্গলা ও সুষুন্না নাড়ীকে নিয়ন্ত্রণ করে বীর্যপাত স্তম্ভন করা যায়–অর্থাৎ বিন্দু সাধনা করা যায়। মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন ও সম্মোহন–এই পাঁচটিকে সহজিয়ারা পঞ্চবান বলেন।

"এই পঞ্চবানের ক্রিয়া আছে মিলন তন্ত্রের শিক্ষায়।
বাণ পুরুষ বীর্য গুন প্রকৃতি রতি –শেখ গুরু দীক্ষায় ॥

মন-প্রকৃতি দেহ পুরুষ সাধন যখন করিবে।
রাধারমণ বুদ্ধি সিদ্ধ দেহতে রহিবে॥"

আবার এক সহজিয়া পুঁথি থেকে পাওয়া যায়–

"সাধক সাধিকা যবে সাধনে সাধিবে।
সাধনের আগেই কুম্ভক শিক্ষা করিবে ॥
চন্দ্রনাড়ী যোগে বায়ু যখন বঁহি আসে।
সেই সাধন কাল সব বাধা যত নাশে।
প্রকৃত প্রকৃতি সাধক প্রথম অভ্যাস সময়।
রজঃকে গৃহ হইতে টানিবা নাহি কর ভয়॥
আকুঞ্চিত করিবে তুমি অপান বায়ু।
লিঙ্গনালে শোষণ করিয়া তাহা বাড়াও আয়ু॥
হঠাৎ কোনকালে বিন্দু প্রচলিত রয়।
ইড়াযোগে নাড়ী উপরে আকর্ষিত হয়॥
রেত বিগলিত বায়ু জানিয়া অপান।
টানিয়া তারে বন্ধ কর তোমার নয়ান ॥

উপরে সাধকের প্রকৃতি (স্ত্রী) মিলনের যে উপায় সহজিয়া পুঁথিতে পাওয়া যায় তা মূলতঃ দৈহিক যৌন মিলনকে কিভাবে প্রলম্বিত করা যায় তার বিকৃত রূপমাত্র। এখানে প্রকৃত সাধনার স্থান কোথায়? এতো আধুনিক যোগ-ভিত্তিক যৌন শাস্ত্রের বইগুলোতেই পরিলক্ষিত হয়।

সহজিয়াদের পদাবলীতে সম্ভোগ হল সর্বশ্রেষ্ঠ রস। কারণ এর মাধ্যমে প্রকৃতি-পুরুষের মিলন হেতু যে চরমানন্দ সৃষ্টি হয়ে সাধকের মনপ্রাণে যে উদ্বেলিত ভাব সৃষ্টি হয়, তা বর্ণনা করা দুরুহ। বাউলতন্ত্রে একে চারিচন্দ্রভেদ বলে। বৌদ্ধতন্ত্রে পরম সম্ভোগ থেকেই নির্বান ও শুণ্যতাবাদ এসেছে। হিন্দুতন্ত্রে **কেবলানন্দ**–অর্থাৎ কেবল আনন্দ আর আনন্দ। সহজিয়াবাদে একেই **মহাভাব** বা মহাসুখভাব বলা হয়।

"দর্শন আর আলিঙ্গনাদির অনুকূলে যে সেবা।
যুবক-যুবতীর মনে দেহে আনন্দ সৃষ্টি করে যেবা॥
পরম রসিকজনের কাছে তাহা হয় সম্ভোগ।
পরাশর বলে শুণহ রসিক–এই রস শ্রেষ্ঠ উপভোগ॥"

তাইতো সহজিয়া সাধক **"তুমি রাধা, আমি শ্যাম"** অথবা সাধিকা **"তুমি শ্যাম, আমি রাধা"** বলে একে অপরকে আলিঙ্গন করে স্পর্শ সুখে প্রথমে আপ্লুত হয় যা একসময় চুম্বন, লেহন, মদন, মাদন, স্তম্বন, ও সম্মোহনে রূপান্তর হতে পারে। আমি এক মঠের দুইজন মহারাজকে একথা জিজ্ঞেস করলে বলেন যে তাঁরা 'দুইজন দুই জায়গায় গিয়ে একসময় ভিন্ন ভিন্ন মহিলার ক্ষেত্রে **"তুমি শ্যাম আমি রাধা"**—এই ভাব দেখে কৌশলে কেটে পড়েছিলেন। শুনেছি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় উপরোক্ত সহজিয়া রীতি-নীতি নাকি নিম্নবর্ণের অশিক্ষিত হিন্দু নর-নারীদের মধ্যে তথাকথিত কিছু গুরুদেবের প্ররোচনায় এখনও রয়েছে।

সহজিয়া সম্প্রদায়ের কিছু অনাচারী নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনকে এতটাই গুরুত্ব দেয় যে তারা পৃথক পৃথক তিথিতে নর ও নারীর কোন্ কোন্ অঙ্গে বেশী কামভাব জাগ্রত হয় তাও গুরুর কাছ থেকে শিক্ষালাভের উপদেশ দেয়। মনে হয় এরা সাধন-ভজনের চেয়ে যৌনতার সাধন-ভজনেই বেশি অভ্যস্ত।

"পুর্ণিমাতে পূর্ণ দেহে কাম বান শরে।
তখন পুরুষ নারী মদন লীলা করে।
প্রতিপদে প্রকৃতির অধরে কাম জাগে।
পুরুষের কাছে যাইয়া চুম্বন ভিক্ষা মাগে॥
দ্বিতীয়া বদন ললাট সিক্তে স্বেদ বিন্দু।
সেই কালে নারী খোঁজে পুরুষের বিন্দু।
তৃতীয়াতে স্তনদ্বয় ভার না যায় কথন।
পুরুষের নির্দয় হাত তাদের করিবে মর্দন॥
চতুর্থে পুরুষ পাগল প্রকৃতির রোষে।
বিপরীত রতি করে পুরুষ নারীর ক্রোড়ে বসে॥
পঞ্চমী তিথিতে উভয়ের পঞ্চ-মকার চাই।
যার সমকক্ষ বিশ্ব চরাচরে নাই॥
ষষ্ঠীতে কামিনী কাঁপে মদন ভরে।
পুরুষ আসিয়া তার দেহখানি ধরে।"

(উৎস ঃ বৈষ্ণবতন্ত্রম্ ঃ সংকলন ও অনুবাদ শ্রী পরাশর।)।

পাঠকগণ, অনুগ্রহ করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। প্রাকৃত-সহজিয়াদের মধ্যে যৌনতা কতটা মারাত্মক স্তরে পৌঁছেছে শুধুমাত্র তার ইঙ্গিত দেয়ার জন্যই উপরের পদগুলির উদ্বৃতি দিলাম।

বৈষ্ণব নামধারী সহজিয়াদের মধ্যে কেউ কেউ রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাকে জড়জাগতিক স্তরে এনে এমন কথাও বলে যে শ্রীকৃষ্ণ রাধার কাছে উপস্থিত হয়ে তার কাম এতটাই জাগ্রত করতেন যে সহ্য না করতে পেরে রাধা বিপরীতভাবে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়তেন। আর এভাবেই বৈষ্ণব যদি প্রকৃতির আরাধনা করতে পারে তবে তার সাধন-ভজন সিদ্ধ হবে—সহজিয়াদের মধ্যে এই ভাবও রয়েছে।

"শ্রীমতি বক্ষ করে কৃষ্ণের প্রার্থনা।
রতিরসরনে না করে কভু বঞ্চনা ॥
অতর্কিতে বিপরীত রতিরণে শুরু করে রাধা।
কৃষ্ণ তবে অতি পুলকিত মনে না দেয় বাধা॥
বিপরীত রতিক্রিয়া আরম্ভ করিলা।
পুরুষের পূর্ণ রসে প্রকৃতি তবে টানিলা।
এমতভাবে বৈষ্ণব প্রকৃতি পুজা করে।
তবেই তাহার সাধন সিদ্ধ হবে প্রকৃতি তরে।"

নিজেদের যৌন কামনা-বাসনা ভোগ করার জন্য রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কি জঘন্য বিকৃতরূপ সহজিয়ারা তৈরী করেছে তা কি কল্পনা করা যায়? কিন্তু সহজিয়াদের কাছে এ কোন অপরাধই নয়। কারণ পরকীয়া সাধনা ছাড়া সাধন-ভজনের আর যে কোন সহজ পথ নেই! পরকীয়া সাধনে অন্যের যে কোন স্ত্রী বা মহিলা সাধকের কুল শক্তি হলেও তার সতীত্ব নাশ হয় না– বৈষ্ণব নামধারী সহজিয়াদের এই বিশ্বাস দৃঢ়।

বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতে পুরুষ-প্রকৃতি মিলনের মাধ্যমে এক মহাভাব জাগ্রত হয়। এরূপ মহাভাব পূর্বকালে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের মধ্যেও ছিল। তখন এদের কুলশক্তি মূলত ছিল সমাজের নিম্নবর্ণের নারীরা। সেখানে ডোম, হাঁড়ি, বাগ্দী, নাপিতানী, রজকীনি, মালিনী এবং এমন কি পতিতাদেরকে পর্যন্ত তারা কুলশক্তির আসনে বসাতেন। তৎকালীন সময়ে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে এসব নিম্নবর্ণের হিন্দুরা সহ বৌদ্ধরা দলে দলে বৈষ্ণবদের আখড়ায়

ভীড় জমাতে আরম্ভ করে। তারা এখানে প্রবেশ করলেও আগের বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রথাগুলোকে একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি। আর তৎকালীন বৈষ্ণব-তান্ত্রিকরা সবাইকে কোলে তুলে নেবার জন্য বৌদ্ধতন্ত্রের নিয়ম গুলোকেও বরণ করে নেয়। এভাবে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকরা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হলেও তাদের আগের অভ্যাস রয়ে গেল। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উভয় বাংলার গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের নুতন নুতন আখড়ার সৃষ্টি হল। আর এসব আখড়াকে কেন্দ্র করেই বহু জায়গায় বৈষ্ণব ধর্মেও তান্ত্রিক সাধন-ভজন তথা সহজিয়া সাধন-ভজনের পথ আরোও প্রশস্ত হয়। এজন্যই আমরা দেখি শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর ছেলে শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভু কয়েক শত মহাযানী পুরুষ বৌদ্ধকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করলেও পরবর্তীতে এরাই নেড়ী বা স্ত্রীসঙ্গী নিয়ে সাধন ভজনে রত অপসম্প্রদায়ে রূপান্তর হয়।

নারী দেহকে বৃন্দাবন মনে করে প্রকৃতি বা নারীদেহের বিভিন্ন স্থানকে সেখানকার বিভিন্ন কুঞ্জবন ধরে নিয়ত রতিক্রিয়ায় লিপ্ত থাকলেই নাকি বৃন্দাবনে বাস বুঝায়—এরূপ কথাও জঘন্য পাপাচারী কিছু সহজিয়া-সাধক মনে করেন। তারা মনে করেন মহাপ্রভুর মন্ত্রও তাই।

"মানব মানবী নহে কভু ত স্বতন্ত্র।
উভয়ই একই দেহ এইতো নিমাই-মন্ত্র।
প্রকৃতি পরম শক্তি সাধনায় সবলা।
পুরুষ যেনতেন প্রকারে হবে অবলা॥
দু'জনে মিলিবে দেহে দেহে ধরি।
তখন পরম রস পাবে আহ্লাদে মরি॥
দেহমন যমুনার ঘাটে হবে হৃদি বৃন্দাবন।
প্রকৃতির দেহে দেখ কত কুঞ্জ-নিকুঞ্জবন॥"

এর চেয়ে আর কি জঘন্য মনোবৃত্তি হতে পারে? এই গানের মধ্যে প্রকাশ্যে যৌন-তান্ত্রিকতার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও সহজিয়াদের কাছে উৎকট যৌন সুখ লাভের মধ্যেই প্রকৃত সাধন-ভজন নিহিত। তারা বলেন ভাব থেকে মহাভাবে উপস্থিত হলেই এভাবে নরনারীর চক্র করা চলে।

সহজিয়ারা **শ্রীমদ্ ভাগবতের** দশম স্কন্ধে বর্ণিত অপ্রাকৃত রাস-লীলারও বিকৃত ব্যাখ্যা দেয়। তারা এর মধ্যে রাগাত্মিকভাব ও সুখের সন্ধান পান।

রাসলীলায় গোপীদের সাথে কৃষ্ণের লীলা হল অপ্রাকৃত স্তরের। রাসলীলার পর প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের মধ্যে রতিরস পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যন্ত্রনাকাতর গোপীরা মুর্চ্ছাগত অবস্থায় উপনীত হন। কারণ রাসলীলাতে তাঁরা পুরুষোত্তম শ্রী কৃষ্ণের যে রতিরস উপলব্ধি করেছিলেন তা পাওয়ার জন্য সবসময়ই উন্মুখ হন। এই চরম মুহূর্তে কৃষ্ণ প্রধানা এক গোপীর (রাধা) সঙ্গে সবার অগোচরে অন্যত্র চলে যান। এই অন্যত্র চলে যাওয়াকেই সহজিয়ারা গোপনে কেলি করা বলেন। তারা মনে করেন প্রধানা গোপীকে নিয়ে কৃষ্ণ গোপনে তন্ত্র সাধনায় লিপ্ত হন। এই মনে করেও সহজিয়ারা অতি গোপনে প্রকৃতি (নারী) সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

বৈষ্ণব নামের সহজিয়ারা নিজেদের সাধন-ভজনের জন্য কিছু রাগাত্মিক পদও রচনা করেন। এই পদগুলিতে সাধনার মূল সুর হল **"বস্তু আছে দেহ বর্তমানে।"** তারা দেহকেই দেউল (সাধন–ভজনের স্থান) করে সাধন-ভজন করেন। চিত্তশুদ্ধি হলেই দেহ শুদ্ধি হয়। তখন সেই দেহ প্রকৃতি-পুরুষের দেউল হয়ে উঠে এবং সেখানেই বৃন্দাবন লীলা শুরুর শ্রেষ্ঠ উপায়–এই হল একশ্রেণীর সহজিয়াদের ভাবনা।

প্রাকৃত সহজিয়ারা মনে করে তারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমরস আস্বাদন করতে পারে। তারা আসলে রাধাকৃষ্ণ লীলার অপ্রাকৃত রসের কোন সন্ধানই পায় না। বর্তমানকালেও প্রাকৃত সহজিয়াদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন, চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখ মহাজনদের গান শুনে কীর্ত্তন করার অভিনয় করে মনে করে যে তারা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমরস আস্বাদন করতে পারছে। আসলে এরা শ্রীকৃষ্ণ লীলা বা অপ্রাকৃত রসের কোন সন্ধানই পায় না। কোন স্বচ্ছ বোতলের মধ্যে মধু দেখে কোন মৌমাছি যদি তা আস্বাদনের জন্য বোতলের উপরই বসে থাকে এবং মনে মনে ভাবে সে সত্য সত্যই মধুর আস্বাদন লাভ করেছে, তাহলে এটি সত্য হবে? রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলারস আস্বাদনের ক্ষেত্রে প্রাকৃত সহজিয়াদের অবস্থানও এরূপ। কারণ তারা রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলারসকে প্রাকৃত স্তরে এনে জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে চায় এবং একই সাথে জড়ীয় কাম-বাসনার মাধ্যমে ঐ রস আস্বাদন করতে চায়। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে–

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ পুরানেতে এই কহে নিরন্তর ॥
(চৈ. চ. মধ্য ৯/১৯৫)।

কিছু প্রাকৃত সহজীয়া আছে যারা পরকীয়া রসে সব সময়ই মগ্ন থাকতে ভালবাসেন। এরা বাইরে বৈষ্ণব বেশধারী হলে হবে কি, ভিতরে জড়রসে ডগমগ। পরকীয়া রস কিভাবে আস্বাদন করতে হয় অপরকে তার জ্ঞানদানের জন্যও এরা আগ্রহী হয়। তাই রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনার সময় এরা অতি অবশ্যই পরকীয়া রসকেই প্রাধান্য দেন। প্রকৃত বৈষ্ণবগণকে এরা অনেক সময়ই রসকসহীন এবং ক্ষেত্রে বিশেষে জ্ঞানমার্গী বলে উপহাস করতেও ছাড়ে না। এখানে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক বলে মনে করি একবার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কুষ্টিয়ায় উপস্থিত হয়ে সেখানকার ভক্তবৃন্দের মধ্যে সম্বন্ধ-তত্ত্বজ্ঞানের (যে তত্ত্বে পরমেশ্বর ভগবানের সাথে জীবের কি সম্পর্ক তা ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন বৈষ্ণব দর্শন অনুযায়ী জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। অর্থাৎ কৃষ্ণ হলেন প্রভু আর জীব হল তাঁর নিত্য দাস) কথা বলছিলেন। সেই সময় একজন প্রাকৃত সহজিয়া ঐ আলোচনাকে একান্তই নিরস মনে করে একসময় ধৈর্য্য হারিয়ে প্রভুপাদকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, **"মহাশয়, আপনাদের এখনও অনেক দেরী আছে। যে ব্যক্তি এজগতে নিজে কখনও পারকীয় রস ভোগ (অর্থাৎ পরদার গমন রূপ ব্যভিচার) না করিল, সে কিরূপে রাধাকৃষ্ণ লীলা বুঝিবে? যিনি যতই গোপন করুন না কেন, এই শরীর দ্বারা পারকীয় রস আস্বাদন না করিয়া কেহই মধুর রসের রসিক ভক্ত হইতে পারেন না! আপনারা কেবল জ্ঞানমার্গের কথা বলিতেছেন। আপনাদের চিত্ত তর্ক যুক্তিতে ভরপুর দেখিয়া প্রভু আপনাদিগকে এখনও মধুর রসের (?) ভজনে অধিকার দেন নাই (?)। আপনারা 'না' বলিলেই কি আমি শুনি? এই দেহের দ্বারা ঐ রসের আস্বাদনই যদি না করা গেল, তবে লোকে কেন মধুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? আহা! অমন রসিক ঠাকুর গৌরাঙ্গের ধর্ম্মই সহজধর্ম্ম, তাহাতে কোন বিচার নাই, তর্ক নাই, আছে কেবল রস! আপনার সঙ্গে আমাকে একটু একাকী থাকিতে দিন, আপনাকে আমি দেখাইয়া দিব– আপনি কতটুকু পারকীয়া রসের আস্বাদন পাইয়াছেন! আপনি দেখিতেছি খবরই**

রাখেন না যে, প্রকৃতি সঙ্গে না থাকিলে কখনও রাধাকৃষ্ণের ভজন হয় না।"
[দ্রষ্টব্য ঃ উপাখ্যানে উপদেশ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ২৯-৩০]

উপরোক্ত ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রাকৃত সহজীয়াদের মধ্যে এমন কামুক লোকও আছে যারা সাধন-ভজনের নাম করে জগৎকেই কামিনীময় মনে করে। এজন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে ঃ

"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"

এরা মৎস-মাংস ভোজনসহ সব ধরনের অনাচার গোপনে করে থাকে। এদের সম্পর্কেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর **"সজ্জন তোষণী"** পত্রিকায় এক নিবন্ধে একসময় মন্তব্য করেছিলেন ঃ **"অনেকগুলি ব্যক্তি কপট-বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন; আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গ দোষারূপ করিয়া তাঁহাকে নব-রসিক গণের মধ্যে গননা করেন! নির্ম্মল চরিত্র শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ সম্বন্ধে মিথ্যা-স্ত্রীসঙ্গী-দোষ-রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন।"** [যোষিৎসঙ্গ = স্ত্রীসঙ্গ]

প্রাকৃত সহজিয়া ব্যক্তিগণের কুমতসমূহকে কৃষ্ণতত্ত্ববিদগণ বার বার খন্ডন করলেও তারা নিজেদের একগুঁয়েমি পরিত্যাগ করে না। তাদের কুসিদ্ধান্তের অস্থিরতা ও ভ্রম হাতে-কলমে দেখাইয়া দিলেও কিছুতেই নিজেদের ভ্রম স্বীকার করিতে চায় না।

সহজিয়াদের মধ্যে অনেকেই ভাবভক্তি বা ভগবৎ প্রেম লাভ করার পূর্বেই কপটতা করে লোকসমাজে ভাবের বিচার দেখাতেও কুণ্ঠিত হয় না। **"আমার ভাব হয়েছে"** –এরূপ কল্পনা করাও কেবল লোক বঞ্চনা এবং আত্মপ্রতারণার সামিল। আগে-হরি গুরু বৈষ্ণব ও ভক্তিতে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, গুরুদেব এবং সাধুদের সঙ্গ লাভ, তাঁদের অনুগত থেকে উপদেশ নিয়ে নিষ্কপটভাবে জীবনযাপন করতে পারলে সব অনর্থের নিবৃত্তি হয়। এ অবস্থায় ক্রমে ক্রমে ভগবানের সেবায় নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি এবং তারপর ভাবের উদয় হয়। এই ভাব অস্থায়ী ভাব নয়– অর্থাৎ একবার এর উদয় হলে তা আর কখনো নষ্ট হয় না। একেই স্থায়ীভাব বা রতি বলে। এই ভাব যখন আরও পরিপক্ক হয় তখনই তাকে প্রেম বলে। তাই এই ভাব বা প্রেম লাভ করা মুখের কথা নয়। প্রাকৃত সহজিয়ারা লোকের কাছ থেকে সম্মান লাভের জন্য কপটতা করে ভাবের সাত্ত্বিক বিকার-সমূহের অনুকরণ করে। ভাবখানা এই-সাধনরূপ বৃক্ষে

উঠার পূর্বেই সিদ্ধি বা ফল লাভ করে ফেলেছে। এদেরকে লক্ষ্য করেই শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তাঁর **"কল্যাণ কল্পতরু"** তে উপদেশ দিয়েছেন-

"মুখে বল'প্রেম প্রেম, বস্তুত ত্যজিয়া হেম,
শুন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্প অকস্মাৎ
মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া ॥
এলোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎ সঙ্গ,
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া ॥
প্রেমের সাধন-ভক্তি, তাতে নৈল অনুরক্তি
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি, নিরন্তর নাম ভজি
কৃপা হলে সুপ্রেম পাইবে ॥
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি
দুষ্ট ফল করিলে অর্জন ॥
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র
তবে প্রেম-হইবে সুলভ ॥
কামেপ্রেমে দেখ তাই, লক্ষনেতে ভেদ নাই
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেম নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়।"

(কল্যাণ কল্পতরু, উপদেশ ১৮-১৯)।

প্রাকৃত সহজিয়াদের আচার-আচরণ ও রীতিনীতি দেখলে বাংলার একটি প্রবাদ বাক্যের কথা মনে পড়ে। সেটি হল **"হেলে ধরতে পার না কেলে ধরতে যাও"**। অর্থাৎ যারা হেলে সাপ (ঢোঁড়া সাপ) ধরতে অক্ষম তারাই কেলে (বিষাক্ত কেউটে) সাপ ধরতে ছুটে যায়। ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করে প্রাকৃত সহজিয়ারা নিজেদেরকে "বাহাদুর' 'দক্ষ' ও সমর্থ বলে প্রচার করতে উৎসাহী হয়। এরাই হেলে-সাপ জাতীয় সামান্য কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ইত্যাদি রিপুগুলিকে বশীভূত করতে না পেরেও কেলে-সাপ জাতীয় অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করতে অগ্রসর হয়। অনর্থগ্রস্থ

সহজিয়ারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা আস্বাদন করা দূরে থাকুক, ধারণাই করতে পারে না। পরম মুক্তপুরুষ ছাড়া তাতে অপর কারো অধিকার নেই। কারণ রাধাকৃষ্ণের লীলাতো দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, লাইলী-মজনু ইত্যাদি জাগতিক নায়ক-নায়িকার প্রীতি ভালোবাসা নয়।

২.৫ কেন প্রাকৃত সহজিয়ারা অপ-সম্প্রদায়?

প্রাকৃত সহজিয়াদের মুখোশ উন্মোচন করতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের রাধাকৃষ্ণ এবং তাঁদের লীলা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হতে হবে। এই সম্বন্ধে আলোচনা করলে তা দীর্ঘায়িত হবে। আর পাঠকদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই **শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের** আলোকে এই সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক এখানে তুলে ধরা হল।

১. প্রথমত ঃ রাধাকৃষ্ণ হলেন একই আত্মা। লীলা বিলাসের প্রয়োজনে তাঁরা দুই দেহ ধারণ করেন এবং অপ্রাকৃত বিলাসে থেকে মাধুর্যরস আস্বাদন করেন।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥"

(চৈ. চ. আদি ৪/৫৬)।

২. দ্বিতীয়ত ঃ শ্রীমতি রাধিকা হলেন কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি যার অন্য নাম হ্লাদিনী শক্তি। অর্থাৎ কৃষ্ণের যে শক্তি তাঁকে আনন্দ দান করেন তাই হল হ্লাদিনী শক্তি তথা শ্রীমতি রাধিকা। আবার এই হ্লাদিনীই করে ভক্তিপোষণ।

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়–বিকার।
স্বরূপ শক্তি–হ্লাদিনী নাম যাঁহার।
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৫৯–৬০)।

হ্লাদিনী শক্তি যখন শ্রীমতি রাধারূপে আবির্ভুত হন তখন তিঁনি মহাভাব স্বরূপে কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ কান্তারূপে পরিচিত হন।

"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম মহাভাব।

মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরানী।
সর্ব্বগুনখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমনী ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৬৮-৬৯)।

শ্রীল রূপগোস্বামী তার **"উজ্জ্বল নীলমণি"** গ্রন্থে বলেছেন, ব্রজগোপীদের মধ্যে চন্দ্রাবলী এবং রাধিকা শ্রেষ্ঠা। আবার এই দুইয়ের মধ্যে শ্রীমতি রাধিকা সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাবস্বরূপ। তাঁর তূল্য গুণ আর কোন গোপীকারই নেই। কারণ কায়মনোবাক্যে তিঁনি কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী হলেন তিন ধরনের। অনন্ত বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ, দ্বারকায় ষোল হাজার একশত আটজন মহিষী (স্ত্রী) এবং ব্রজগোপীগণ। শ্রীরাধা থেকেই ব্রজগোপীগণের উৎপত্তি। অবতারী কৃষ্ণ যখন এই ধরাধামে অবতরণ করেন তখন তার হ্লাদিনী অংশ রাধা থেকেই উপরোক্ত তিনপ্রকারের বিস্তার হয়। আর গোপীগণ হ্লাদিনী শক্তির একাংশরূপে পূর্ণ হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতি রাধিকার সহায়রূপে নানান ভাব ও রসে কৃষ্ণকে রস আস্বাদন করায়। এক্ষেত্রে রাধিকা হলেন প্রধানা গোপিনী। এই কারণে তাঁকে গোবিন্দমোহিনী, গোবিন্দের আনন্দদায়িনী, গোবিন্দ সর্ব্বস্ব এবং সর্ব্বকান্তা শিরোমনি বলা হয়।

শ্রীমতি রাধিকা হলেন প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। রাধা হলেন তাই কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি। আর কৃষ্ণ হলেন পূর্ণ শক্তিমান। এই দুইয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই। পূর্ণ শক্তিমানের সব বাঞ্ছা পুরণ করাই পূর্ণশক্তির কাজ। তাই শ্রী কৃষ্ণের রাস-লীলার প্রধান উপায় বা ভিত্তি হলেন তাঁরই হ্লাদিনী শক্তি রাধা। এজন্যই রাধাকৃষ্ণের রাস-লীলায় যে মিলন সেখানে কৃষ্ণের শক্তি তার সাথে একরূপ /একাত্ম হয় মাত্র। শক্তিতো শক্তিমানের সাথে মিলিত হতে চাইবেই। এজন্যই আমরা দেখি শ্রীমতি রাধিকা সর্বত্র সববস্তুতেই শ্রীকৃষ্ণকেই অবলোকন করেন। তার চোখে সবছিুতেই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান।

"কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥"

(চৈ. চ. আদি ৪/৮৫)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমতি রাধিকার ভাব এবং কান্তি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হন। তিনি এভাবে অবতরণ করে দুই ধরনের কার্য সম্পাদন করেন। একদিকে তিনি জাতিধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মুক্তির জন্য নাম

সংকীর্ত্তণ প্রচার করেন এবং এই ব্যাপারে তাঁর প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর নেতৃত্বে অপরাপর পার্ষদ ও ভক্তগণকে নাম প্রচারে নিয়োজিত থাকার আদেশ দেন। অন্যদিকে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণ প্রেমের বিভিন্ন রস আস্বাদন করেন। আর কৃষ্ণ ভক্তদের জন্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রসের কথা প্রকাশ করলেন। পরবর্তীতে এসবের মধ্যে শৃঙ্গার রসকেই সবচেয়ে মাধুর্যময় বলে স্বীকৃতি দিলেন। এই মাধুর্যময় রস স্বকীয়া এবং পরকীয়া ধরনের হতে পারে। এদের মধ্যে আবার পরকীয়া রসই প্রধান। কিন্তু সাথে সাথে আবার সতর্ক করে দিলেন যে এরূপ রস কেবলমাত্র ব্রজেই আস্বাদন করা সম্ভব। কারণ এই ধরনের রসে কেবলমাত্র গোপীরাই আপ্লুত হতে পারতেন। এই রসের মধ্যে কোন দৈহ্নিক কাম-গন্ধ নেই, আছে নির্ম্মল প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ রাধা ও গোপীগণ থেকে যে মাধুর্যরস আস্বাদন করতেন তা নিজে অনুভব করার জন্যই চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমতি রাধিকার ভাব নিয়ে আবির্ভূত হন। আর পুরীতে অবস্থানকালে গম্ভীরা লীলায় মহাপ্রভু বিভিন্নভাবে কৃষ্ণ বিরহে অনেক সময় প্রলাপ বকতেন, কখনো বা উন্মাদের মতো আচরণ করতেন।

"রাধিকার ভাব -মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেইভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর।"
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ
ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময়-বাদ।
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে, রাত্রি-দিনে॥"

(চৈ. চ আদি ৪/১০৬–১০৮)।

গোপীগনের প্রেমে ছিল রূঢ়ভাব–অর্থাৎ বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম। এই প্রেম জড়ীয় কাম নয়। কারণ নিজের ইন্দ্রিয়ের প্রীতির জন্য যে প্রেম তাকেই কাম বলা যায়। আর কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির লক্ষ্যে যে ইচ্ছা তাকে প্রেম বলা হয়। নিছক কামের মধ্যে থাকে যৌন সম্ভোগের বাসনা। কিন্তু কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে সমর্পণ করলেই তাকে বলে কৃষ্ণ প্রেম।

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা–তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য –নিজ সম্ভোগ কেবল।

কৃষ্ণসুখতাৎপর্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল॥"

(চৈ. চ. আদি ৪/ ১৬৫–১৬৬)।

এই কৃষ্ণ প্রেমে উন্মুখ হলেই জীব লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহ ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ সুখ, আত্মসুখ, নিজ পরিজন, সর্বস্বত্যাগ করে কৃষ্ণের সাধন-ভজনে নিয়োজিত হতে পারে। ব্রজের গোপীরা এই ভাবেই কৃষ্ণপ্রেমে নিয়োজিত ছিলেন। কৃষ্ণের সুখেই ছিল তাঁদের সুখ, কৃষ্ণের দুঃখেই ছিল তাদের দুঃখ। কৃষ্ণের জন্যই তাঁরা সব ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এ যে আচরণ তা ছিল কৃষ্ণের জন্য শুদ্ধ অনুরাগ।

"অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম–অন্ধতমঃ, প্রেম–নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
আত্ম সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥"

(চৈ. চ. আদি ৪/১৭২–১৭৫)

গোপীরা রাসলীলার পূর্বে বিভিন্নভাবে নিজেদেরকে সজ্জিত করেন। কিন্তু তা নিজের প্রীতির জন্য নয়। কৃষ্ণ এই সাজ সজ্জা দেখে পুলকিত হবেন এই তাদের লক্ষ্য। আর কৃষ্ণের সুখ বাড়লেই তাদেরও সুখ বাড়ে। এই কারণেও গোপী প্রেমে কোন কাম-গন্ধ নেই।

এই গোপীদের মধ্যে সর্বোত্তম গোপীকা হলেন শ্রীমতি রাধিকা। তিনি অপরাপর গোপীদের তুলনায় রূপে, গুণে এবং প্রেমের দিক থেকে ছিলেন সর্বোত্তম। এই রাধার সাথেই কৃষ্ণ অপ্রাকৃত প্রেমরস আস্বাদন করতেন। আর সব গোপীরা তাঁদের রসের উল্লাস বৃদ্ধির জন্য সব ধরনের উপকরণ দ্বারা সহযোগিতা করতেন। রাধা যখন যেভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হতেন সেই সেই ভাবের উপকরণ তখন যোগান দিতে ব্রজগোপীরা কার্পণ্য করতেন না। কারণ রাধা-কৃষ্ণের সুখেই যে তারা সুখী হতেন।

"রাধাসহ ক্রীড়া-রস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরন ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন।
তাহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥"

(চৈ. চ. আদি ৪/২১৭–২১৮)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে রাধাকৃষ্ণের লীলা সম্পর্কে আমরা নিম্নোক্ত তথ্য পাই ঃ

(i) রাধাকৃষ্ণের প্রেম অপ্রাকৃত। স্বয়ং কৃষ্ণই তাঁর হ্লাদিনী শক্তির সাথে বিভিন্ন ভাবে প্রেমরস আস্বাদন করেন। কারণ রাধাকৃষ্ণ অদ্বয় তত্ত্ব।

(ii) রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় ব্রজগোপীরা সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করেন মাত্র। তাঁরা সরাসরি কৃষ্ণের সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হতে চান না বা হন না। রাধাকৃষ্ণের সুখেই তারা সুখী।

(iii) চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমের রস আস্বাদনের জন্য রাধাভাবে ভাবিত হয়ে তাঁর গম্ভীরা লীলার সময় বিভিন্নভাবে উদ্বেলিত হতেন। অনেকের মতে তিনি রাধাভাবে ভাবিত হয়ে পরকীয়া রস আস্বাদন করতেন।

(iv) মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেম রস আস্বাদনের জন্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের কথা বলেন। আর এই সবের মধ্যে মধুর রস হল সর্বপ্রধান। কিন্তু উপরোক্ত মধুর রস আস্বাদন করতে গেলে জীবকে মঞ্জরীভাবে কৃষ্ণের সেবা করতে হবে। একেই রাগানুগ মার্গের ভজন বলে যার উপর ষড়গোস্বামীগণ –বিশেষত শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন।

"রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেইজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

(চৈ. চ. মধ্য ৮/২ ২০)।

মহাপ্রভু নিজে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের প্রেম সুধা আস্বাদন করতেন। কিন্তু সাধারণ মানব-মানবীর পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তার জন্য দরকার সিদ্ধ দেহ। সেই দেহ কয়জনের আছে? আবার ঐশ্বর্য জ্ঞানে অর্থাৎ স্বকীয়াভাবে ভজলেও ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে গোপীর আনুগত্য চাই–

"গোপী আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত, – লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥"

(চৈ. চ. মধ্য ৮/২২৯)।

সখী ও মঞ্জরীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সখীর সঙ্গে কখনো কখনো কৃষ্ণের সম্ভোগ ঘটে। কিন্তু মঞ্জরীর সাথে হয় না। এমনকি রাধাকৃষ্ণের লীলাও সে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পারে না। সে রাধার সেবা করবে দুই সময়। একবার যখন রাধা অভিসারে যাবেন তখন। আর একবার কৃষ্ণ সম্ভোগের পর রাধা ক্লান্ত হয়ে এলে তাঁর শ্রান্তি দূর করবেন।

প্রকৃত বৈষ্ণব সাধক সর্বদা নিজেকে মঞ্জরী কল্পনা করে শ্রীরাধার অঙ্গ সেবা ও পরিচর্যায় সখীদের নির্দেশমত কাজ করবেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী মঞ্জরীভাব গ্রহণের কথা বললেও সহজিয়ারা তা মানতে রাজী নন। তারা রাধাকৃষ্ণের লীলায় যৌন লালসার গন্ধ খুজে পান। এজন্য প্রকৃত বৈষ্ণবদের সহজিয়াদের মত অনুসরন করা কোনক্রমেই উচিত নয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী পরকীয়া প্রেমকে গাঢ় না করে লঘু করে এড়াতে চেয়ে বলেছেন–রাধা শ্রী কৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী। তিনি পরকীয়াবাদের আদিরসকে সমর্থন করতে চাননি। হয়তো এই তীক্ষ্ম প্রতিভাধর বৈষ্ণব মহাজন সন্দেহ করেছিলেন রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের আধ্যাত্মিক গূঢ় রহস্য সাধারণ নরনারী বুঝতে না পেরে বিপথে পা বাড়াবে। শ্রীরূপের সন্দেহ পরবর্তীকালে বাস্তবে পরিণত হয়। একশ্রেণীর বৈষ্ণব নামধারী লোকের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতায় ঘুন ধরে। দেখা গেল যৌন তান্ত্রিকতা।

প্রকৃত বৈষ্ণবের কর্তব্য সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য উত্তরকালে শ্রীল জীব গোস্বামী সতর্ক করে বলেছেন যে সাধক ও ভক্তের কাছে নিজেকে রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলায় পরিকর রূপে চিন্তা ও ধ্যান করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। সাধক ও ভক্ত নিজেকে সব সময় সখীর অনুগত মঞ্জুরী স্বরূপা ভাববেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীল রূপ গোস্বামী এই মঞ্জরীভাবে সাধন ভজনের প্রথম পথ প্রদর্শক। তিনি তাঁর এক গ্রন্থে শ্রীমতি রাধিকাকে বাতাস করবার এবং তাঁর কেশ পরিচর্যা এবং তাম্বুল যোগানের ভার নিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি

মঞ্জরীভাবে রাধার দীন সেবিকা ব্রত নিতে চান। তিনি প্রার্থনা করেন, **"হে প্রানদেবতা রাধাকৃষ্ণ! তোমরা যুগলে যমুনা তীরে কুঞ্জ-নিকুঞ্জ বিহার করতে করতে স্বেদাক্ত শ্রান্ত হয়ে যখন ললিতলবঙ্গকুঞ্জে বিশ্রাম করবে, তখন দীনা মঞ্জরী রূপ আমি নিজের কুন্তলপাশ মুক্ত করে তা দিয়ে তোমাদের পাদপদ্মধুলি কবে মুছিয়ে দেব?"** প্রকৃত বৈষ্ণবদেরকে শ্রীরাধার দাস-দাসী হতে হবে। অন্য কিছু হবার যেন সাধ না জাগে, রাধার সখীভাব তো নয়ই। তাদেরকে দূর থেকেই রাধাকৃষ্ণের লীলা আস্বাদন করতে হবে। এতেই পরমানন্দ লাভ হবে। এভাবেই নিজের মনের মধ্যে নিত্য বৃন্দাবন বিরাজ করবে।

"নিজেকে ভাবিবে সদা সখীদের সঙ্গিনী।
সখীদের আজ্ঞায় সেবা কর রাধা ঠাকুরানী ॥
তাঁদের প্রসাদী বসন ভূষণ আনো গোপ কিশোরী ভাবে।
তাহা দিয়া নিজে সাজো মানো মঞ্জরী রূপে ॥
মঞ্জরী হইয়া রাধা কৃষ্ণের লীলা বিলাস চিন্তিবে।
তাঁদের নির্দেশ মানি সব ছাড়ি তুমি ব্রজবাসী হবে।"

সাধক ও ভক্তরা ভৌম-ব্রজে যেতে না পারলেও ক্ষতি নেই। তাকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে হবে-**"আমি সব সময় ব্রজেতে আছি।"** শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী রচিত **"বিলাস কুসুমাঞ্জলি"** গ্রন্থে মঞ্জরীভাবের কাজের ব্যাখ্যা রয়েছে। কবি **রাধাবল্লভ দাস** তার যে অনুবাদ করেছেন সেখান থেকে পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে কিছু অংশ তুলে ধরা হল-

"হে ভামিনী কবে পদাম্বুজ দুই তব।
জলধার দিয়া তাহা প্রক্ষালন করিব ॥
গৃহান্তরে বসাই নিজ বেশ দিঞা।
মার্জন করিব তাহা আনন্দ করিঞা।" ইত্যাদি।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তার **"কীর্ত্তন পদাবলীতে"** যে প্রার্থনা করেছেন তাই হল মঞ্জরীভাবের প্রকৃত সাধনা।

"রাধাকৃষ্ণ প্রাণ—মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরনে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কুলে কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর পরে বসাব দুজন॥
শ্যাম—গৌরী অঙ্গে দিব, চুয়া-চন্দন গন্ধ।
চামর ঢুলাব করে হেরব মুখচন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুল ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরনার বিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস ॥"

কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়ারা আরোও দুই ধাপ এগিয়ে গিয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলাকে জড়ীয় রূপ কল্পনা করে যৌন সংসর্গের মাধ্যমে তথাকথিত রসসমুদ্রে সাতার কেটে ভবসমুদ্র পাড়ি দিতে চান। বৈষ্ণব নামের সহজিয়াদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রীল রূপ গোস্বামীর মঞ্জরী ভাবকে কিছুটা মর্যাদা দান করলেও শেষ পর্যন্ত তারা সরাসরি রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমলীলাই দেখতে চান এবং রাগাত্মিকভাবে পেতে চান দেহাত্মবাদের মাধ্যমে—যা অসাধুতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মঞ্জরী ভাবের সাধনাও উচ্চস্তরের। সাধারণ ভক্তেরা শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, বন্দন, ইত্যাদির মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি পূজা করতে পারেন মাত্র। কারণ বহুদিন ব্যাপী সাধনার দ্বারা সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হলেই মঞ্জরীভাব আসতে পারে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রেমের যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন তার সাথে সহজিয়াদের প্রেমের তফাৎ সহজেই ধরা পড়ে। সহজিয়াগণ প্রথম থেকেই দেহাত্মিক প্রেমভাব সম্ভোগ সাধনযজ্ঞে নরনারীর রতিরস আস্বাদনের কামনা করেন। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণবদের কাছে এই রীতি দুর্নীতি ও অসদাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ প্রেমের স্পর্শ লাভ করার জন্য সাধককে আটটি স্তর অতি সতর্কতার সাথে অতিক্রম করতে হবে।

(i) শ্রদ্ধা (ii) সাধু সঙ্গ (iii) ভজনক্রিয়া (iv) অনর্থ নিবৃত্তি (v) নিষ্ঠা (vi) রুচি (vii) আসক্তি এবং (viii) রতি।

মঞ্জরীভাব পেতে হলে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা থাকা চাই। শ্রদ্ধাই "রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা" সেবার বীজ। এই শ্রদ্ধাভাবই সাধু সঙ্গ করায়। সাধুসঙ্গের প্রধান কাজ হল শ্রবণ, কীর্ত্তন ইত্যাদির প্রত্যক্ষ প্রেরণদাতা। এতে অনর্থ নিবৃত্তি হলে আসে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা থেকে রুচি উৎপন্ন হয়। এই রুচি থেকে আসক্তির সৃষ্টি হয়। আসক্তি থেকে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ প্রীতির অংকুর। সেই রতি গাঢ় হলে সৃষ্টি হয় প্রেম। এই সময়েই রাধাকৃষ্ণের লীলা সংকীর্ত্তন শ্রবণ না করলে সাধকের মনে হয় এই জীবন বৃথা গেল। ইন্দ্রিয়ভোগ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়স্পর্শ বস্তুর প্রতি তার ঘৃণা জন্মে। তাঁর একমাত্র ইচ্ছা হয় রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা দর্শন। আর এরূপ রস আস্বাদনের শক্তি অভক্ত সহজিয়াগণের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তরাই তা করতে পারেন। কারণ বৈষ্ণব সহজিয়ারা হল অসৎ, স্ত্রী-সঙ্গী এবং কৃষ্ণের অভক্ত। তাই এরূপ অসৎদের সঙ্গ প্রকৃত বৈষ্ণবদের অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

"অসৎসঙ্গত্যাগ,–এই বৈষ্ণব আচার
স্ত্রীসঙ্গী–এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"
(চৈ. চ. মধ্য ২২/৮৪)।

৩ গৌরনাগরী সম্প্রদায়

এই অপ-সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রী গৌরসুন্দরকে (শ্রী গৌরঙ্গ মহাপ্রভুকে) কৃষ্ণের ন্যায় নাগর (নায়ক বা পতি) সাজে সাজায়। তাঁর হাতে বাঁশী গুজে দেয় এবং মাথায় ময়ুরের পুচ্ছ দেয়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা কখনো কখনো শ্রী গৌরসুন্দরকে গোপীবেশে নাগরী (স্ত্রী বা পত্নী) এবং কখনো বা কৃষ্ণবেশে নাগর সাজায়। তাদের যুক্তি হলো শ্রী গৌর সুন্দর একই সাথে (যুগপৎ) শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতি রাধিকা। তাই তাঁকে কৃষ্ণ (নাগর) এবং রাধিকা (নাগরী) রূপে সাজানোর ব্যাপারে কোন বাধা নেই বরং এতে বেশী রস আস্বাদন করা সম্ভব। প্রয়োজনে এই সম্প্রদায়ের কেউ কেউ শ্রী চৈতন্য ভাগবত এবং শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত থেকে এ বিষয়ে উদ্বৃতি দিয়ে থাকেন।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য–গোসাঞি ব্রজেন্দ্র কুমার
রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥"
(চৈ. চ. আদি ৪/২২২-২২৩)।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি ॥"
(চৈ. চ. আদি ৪/ ৫৬–৫৭)।

"তাতে জানি, মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥
(চৈ. চ. আদি ৪/২৬১–২৬২)।

গৌরনাগরীবাদীরা **শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত** গ্রন্থের উপরোক্ত শ্লোক সহ আরো কিছু শ্লোকের বিকৃত অর্থ করে যুক্তি দেখান যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একদিকে নাগর (নায়ক) এবং অন্যদিকে নাগরীও (নায়িকা)। তাই তাঁকে নাগর সাজিয়ে নিজেরা গোপী সেজে তাঁকে মধুর রস আস্বাদনের সুযোগ করে দেয়া উচিত। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণরূপে বিবেচনা করে কৃষ্ণের বেশভুষায় সজ্জিত করে তাঁর সাথে রাসলীলায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে নিজেদের গোপীভাবে ভাবিত হওয়ার মধ্যে কোন অপরাধ নেই। এককথায় গোপীভাবে মহাপ্রভুর সেবা করার মধ্যে কোন দোষ নেই। আবার অন্যদিকে মহাপ্রভুকে রাধা বেশে সাজিয়ে গোপী হিসাবে তার সঙ্গী হয়ে কৃষ্ণ রস আস্বাদন করা যেতে পারে। এতেও দোষের কিছু নেই বলে গৌরনাগরীবাদীরা মনে করেন। এক সময়ে উপরোক্ত গৌরীনাগরীবাদের সমর্থকদের মধ্যে অনেক বিদ্যান ব্যক্তিও ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আমলেই নবদ্বীপের **শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ** পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস

গোস্বামী মহোদয় এই গৌরাঙ্গ নাগরীবাদের সমর্থক ছিলেন। এক সময় এই বিষয়ে সরস্বতী ঠাকুরের সাথে তাঁর আলোচনা হয়। সরস্বতী ঠাকুর তাঁকে গৌরনাগরীবাদ যে অশাস্ত্রীয় ও ভক্তিবাদের বিরুদ্ধে সে বিষয়ে বহু প্রমাণ বাক্য বলে পরিশেষে শ্রীল বৃন্দাবন দাস কর্তৃক লিখিত **শ্রী চৈতন্য ভাগবত** গ্রন্থ থেকে নিম্নোক্ত উদ্বৃতি দেন-

"এই মত চাপল্য করেন সবা মনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে ॥
স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণ না করিলা, বিদিত সংসারে।
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি করে ॥
(চৈ. ভা. আদি ১৫/২৮-৩০) ।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেন, যে গৌরাঙ্গ স্ত্রীলোকের মুখ পর্যন্ত দর্শন করতেন না তাঁকে নাগর রূপে প্রচার করার পেছনে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। কোন কোন গবেষক দাবী করেন যে মহাপ্রভুর প্রকটকালেও নবদ্বীপে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ব্রজ-নাগর শ্রীকৃষ্ণের মত গৌরাঙ্গদেবকে নদীয়া নাগর রূপে কল্পনা করে গৌরনাগরী ভাবের উপাসনা প্রচলন করেন। শ্রী লোচনদাস নাকি এই ভাবের সমর্থক ছিলেন।

[দ্রষ্টব্য ঃ **অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী ঃ** শ্রীচৈতন্য ধর্মের স্বরূপ, রূপান্তর ও সংস্কার, পৃঃ ৪৪] আবার কেউ কেউ দাবী করেন যে, সাধক চৈতন্য দাস এবং সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই গৌরাঙ্গ নাগরীবাদ প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর এক নিবন্ধে উপরোক্ত দাবীসমূহ অসার এবং অসত্য বলে প্রতিপন্ন করেন।

[দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীল **ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ঃ** শ্রী গৌরভজন, ভগবৎ দর্শন, হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের মাসিক পত্রিকা, মায়াপুরধাম, মার্চ ১৯৮৭ সংখ্যা।]

তিনি বলেন ঃ "নবদ্বীপ নাগরীবাদ উদ্ভাবন কে করিল, কোন্ সময় এই দুর্নীতি ধর্মজগতে প্রবেশ করিল, কাহারাই বা এই দুর্নীতিকে অনর্থক কালে ধর্মের সাধন-ভজন বলিয়া চালাইতে আরম্ভ করিল? ঠাকুর নরহরির সহিত কি

এই ভজন-বিরোধী অবৈধ অনুষ্ঠানের কোন সম্বন্ধ আছে? প্রশ্ন হইলে আমরা বলিতে চাই, যাঁহারা ঠাকুরের **"ভজনামৃত"** দেখিয়াছেন, তাঁহাদের এরূপ ভ্রম হইতে পারে না। সিদ্ধ চৈতন্যদাস এই অবৈধ অনুষ্ঠানকে ভজন বলিয়া চালাইয়াছিলেন কিনা, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুদ্ধ ভক্তগণ বলেন, কতিপয় অবৈধ দুর্নীতিপরচিত্ত ব্যক্তি চৈতন্যদাসের ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাধক চৈতন্যদাস বলিতে গিয়া স্বীয় কুনীতি-পুষ্ট চঞ্চল প্রতীতি দ্বারা নিজ ধারণায় সত্যানুষ্ঠানকে বিকৃত করিয়াছেন মাত্র। চিড়িয়া কুঞ্জের সিদ্ধ কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে এই নদীয়া নাগরী ভজনের কথা অন্যায়পূর্বক আরোপ করা সত্য বিরুদ্ধ মাত্র। চৈতন্য দাসের অলৌকিক ভাব বুঝিতে না পারিয়া আমরা যদি তাঁহাকে নদীয়া-নাগরীর দৌরাত্মপূর্ণ অবৈধ সাধক শ্রেণীভুক্ত করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধ ব্যতীত আমরা আর কিছুই করিলাম না। ছাগল-হারান বুড়ির রামায়নের কথক ঠাকুরের দাড়ি সঞ্চালন দেখিয়াও পাঠ শ্রবণের মত মহৎ বৈষ্ণবগণের চরিত্র পবিত্রময় আমি বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজ কুনীতি ভাবের সংযোজন করা আদরণীয় নহে।"

গৌরনাগরীবাদ কতটা ভক্তিবিরুদ্ধ তা প্রমাণ করতে গেলে আমাদেরকে শ্রীগৌর এবং তাঁর ভজন সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। সাধারণ অর্থে ভজন শব্দের অর্থ সেবা করা বুঝায়। তাহলে সেব্যবস্তু কি তা আগে জানা দরকার—অর্থাৎ কার সেবা বা ভজন করবো তাঁর সম্পর্কে পূর্বেই ভালভাবে জানা প্রয়োজন। তাই নয় কি? কারণ সেব্যবস্তুর সঠিক পরিচয় জানা না থাকলে অপর কোন বস্তুর সেবা হয়ে পড়তে বাধ্য। এই কারণেই শাস্ত্রে সম্বন্ধ (সম্পর্ক), অভিধেয় (উপায়) এবং প্রয়োজন—এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

শ্রীচৈতন্য দর্শনে জীব হল কৃষ্ণের নিত্যদাস। শ্রীগৌর হলেন স্বয়ং ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রী গৌড় ভজনে ভক্ত এবং গৌড়ের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকবে তাই হল সম্বন্ধ। অর্থাৎ ভক্তের সাধন-ভজনে ভগবানই সম্বন্ধ। শ্রী ভগবান ভজন এবং ভক্ত-সম্বন্ধ জ্ঞানরহিত হয়ে অবস্থান করেন না। যেখানে সম্বন্ধ তত্ত্ব বা সম্বন্ধের বিষয়বস্তু ভগবান নন, সেখানে সম্বন্ধ তত্ত্বে আর ভগবান থাকেন না। এক্ষেত্রে ভক্ত এবং ভক্তি আর থাকে কোথায়?

আমরা বেশীরভাগই বদ্ধ জীব। আমাদের ইন্দ্রিয় সকল অনিত্য, জড় এবং নশ্বর ভোগেই ব্যস্ত থাকে। এরূপ বদ্ধজীবের চোখে তাই সচ্চিদানন্দ (সৎ, চিৎ ও আনন্দময়) বিগ্রহ গৌর সুন্দরের স্বরূপ দেখার সাধ্য কোথায়? তাই বদ্ধজীবের ভোগের অন্যতম নশ্বর বস্তুজ্ঞান গৌরসুন্দরে নিবদ্ধ হলে তাঁকে ভোগ্যজ্ঞান করা হবে মাত্র। এই অবস্থা ভজনের অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলা যায়। কারণ ভজনের নামে ইন্দ্রিয়–তর্পন অথবা অনিত্য ভোগময়ী ধারণাও শোভনীয় নয়।

গৌরভক্ত বলে অনেকে নিজেদেরকে অভিমান বা গর্ব অনুভব করেন। এটি সুন্দর কথা। কিন্তু এই অভিমান করে যারা নিজের ইন্দ্রিয় তর্পন মাত্র সার জ্ঞান করেন তারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনের বস্তু জানার প্রতিকূলে নিজের নশ্বর রূপ, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দগঠিত গৌর কল্পনা করেন মাত্র। এতে শ্রী গৌরের ভজন হওয়া দূরে থাকে, অনর্থময় বিষয় গ্রহণ হয়ে যায়।

শ্রীমদ্ ভাগবত বলেন, ভগবদ্‌বস্তু অধোক্ষজ। অধোক্ষজ শব্দে এই বুঝায় যে শ্রী ভগবান জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু। অর্থাৎ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পন অথবা ভোগের বস্তু মাত্র নন। শ্রীল জীবগোস্বামী তাঁর **ভক্তি সন্দর্ভে** বলেন ঃ

"অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ।"

অধোক্ষজ শব্দে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের (শ্রীকৃষ্ণ) সাথে অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগৌর সুন্দর লক্ষিত হন। তাই গৌরসুন্দর কোনক্রমেই আমাদের ভোগ্য বস্তু হতে পারেন না। অন্যকথায় বলা যায় শ্রী গৌরসুন্দর জড় বস্তু নন। তাই গৌরের রূপ জড়ের রূপ নয়। আমাদের স্থুল ইন্দ্রিয় সকল জড়বস্তুর রূপ আস্বাদন বা ইন্দ্রিয়-তর্পনের জন্য ব্যস্ত হয়। এতে আমরা কৃষ্ণ বিস্মৃত হয়ে পড়ি। শ্রী গৌরহরির রূপ অপূর্ব। এই রূপ জড় বস্তু নয়। তাই গৌরহরির রূপ দর্শনে আমাদের ভোগ উদ্রেকতো হওয়ার কথা নয়, বরং ইন্দ্রিয়-তর্পন পিপাসা চিরদিনের জন্য থেমে যাওয়ার কথা।

শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। তাঁর মধ্যে শ্রী রামানন্দ রায়ের মতো নিষ্কাম এবং শুদ্ধ ভক্তগণের সেবনীয় বস্তু উচ্ছলিত হতে পারে মাত্র, নদীয়া নাগরীগণের জড় ভোগবাসনা প্রদীপ্ত হতে পারে না। গৌরনাগরীবাদের অনুসারীরা জড় ভোগের ধারনায় বিশ্বাসী। এই না হলে তারা কেন

জড়ভোগের বশবর্তী হয়ে কামরিপু চরিতার্থের জন্য জড়-নাগর অন্বেষণ করেন? এতে বরং জড়কাম ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে জীবকে হরিভজন থেকে বিষয়ভোগে লিপ্ত করায়। অহৈতুক নির্মল প্রেম এক্ষেত্রে লুপ্ত হয়ে নিজের ইন্দ্রিয় প্রীতি স্থাপিত হয়।

শ্রী গৌরহরি ভোগের কোন বিশেষ বস্তু নন। তিনি অর্চন বা পুজার বস্তু। কৃষ্ণে-উন্মুখ জীবের ভজনের বস্তু। বিষয়ভোগে যাদের স্পৃহা থাকে সেরূপ ব্যক্তিগণ ষড়-ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে ভোগময় জগতে বিচরণ করেন। গৌর ভজনের নামে তাঁকে নাগর বা নাগরীরূপে সজ্জিত করে ছলনা করে তথাকথিত সেবা শেষ পর্যন্ত আমাদের জড় ইন্দ্রিয়পরায়নই বৃদ্ধি করে মাত্র। আমাদের পতি, পত্নী, পুত্র, প্রভু, ভৃত্য ভোগের বস্তু। গৌরাঙ্গ এরূপ অনিত্য, অজ্ঞানময় এবং নিরানন্দের আধার বা বিষয়বস্তু নন।

তিনি নদীয়া-নাগরীগণের ভোগের বস্তু নন বলেই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। দুভার্গ্যবশত যদি তাঁকে জড়ভোগের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে নাগর বলে মনে করি এবং নিজেরা ভোক্তা রমণী-সজ্জায় নাগরী বলে অভিমান করি তাহলে সেটি গৌরভজন না হয়ে ইন্দ্রিয়ের তর্পন বলে স্বীকার করাই আমাদের উচিত হবে।

এই উপমহাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিকূল ভক্তিহীন জড় ইন্দ্রিয়ের ভোগবাসনা পূরণের জন্য শক্তি-উপাসনা অনেকদিন থেকেই প্রচলিত রয়েছে। গৌড় নাগরীবাদ পরোক্ষভাবে হলেও এরূপ ভক্তিহীন উপাসনার প্রশ্রয় কি দেয় না? কারণ গৌরকে কেন্দ্র করে গৌর ভক্তি কলঙ্কিত করার লক্ষ্যে তাঁকে জড়ের রূপ, জড়ের গুণ, এবং জড়ের ক্রিয়ায় সাজিয়ে ক্ষণকালের জন্য নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কল্পনাকে ভজন হিসাবে বিচার করতে যাওয়া কি এক ধরনের গৌরবিদ্বেষী কাজ নয়? গৌর তো জড়বস্তু নন, তাঁর দেহ তো জড়-দেহ নয়। তাঁর রূপতো জড়ীয় রূপ নয়, বরং চিন্ময় রূপ। গৌরের গুণতো প্রাকৃত বা নশ্বর পৃথিবীর কোন বস্তুর গুণের মতো নয়। গৌরলীলাতো ইন্দ্রিয়পরায়নের ভজন-ছলনামাত্র নয়।

শ্রীগৌরহরির নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। গৌর হরির রূপ গৌর। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। নিত্য গৌররূপ বলে কৃষ্ণেতর নন। তিনি মহাবদান্য এবং কৃষ্ণপ্রেম প্রদানকারী। তিনি অসামান্য কৃপালু। তাই কোন অবৈধ জড়-ভোগের

তাড়নায় তাঁকে নাগর বলার দুঃসাহস কোথায়? নাগরীভাবে তাঁর ভজন-সাধনের কল্পনা কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল পথ মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর কি কোন দুরাচার অভিনয় নিজ লীলায় প্রদর্শন করেছিলেন যে আমরা দুঃসাহসিকতার বশবর্ত্তী হয়ে তাঁকে অবৈধ ভোগ্য-নাগর বলতে পারি? তিনিতো কোন দিন কোনভাবেই স্ত্রী-পরায়ণ ছিলেন না। তাই পরস্ত্রী-প্রেক্ষানপর, পরস্ত্রী-চিন্তনভাব, অবৈধ ইন্দ্রিয় তর্পন-পর নাগররূপে যথার্থ শ্রী গৌর ভক্তগণ কোনদিন তাঁকে কল্পনাও করতে পারেন না।

হরিভজন কোন মনগড়া অনুষ্ঠান নয়। যারা ভগবৎ-ভজন না করে অন্য কোন জড়-ধারণার সাথে হরি ভজনকেও ভোগময় অনুষ্ঠান মনে করেন, তারাই ভক্তিযাজনের নামে নদীয়া নাগরীবাদ অন্যায়পূর্বক ভক্তিপথের অন্তর্গত বলতে পারেন। শুদ্ধভক্তগণ একে কোনক্রমেই ভক্তিমার্গ বলে মেনে নেবেন না।

৪ গৌরবাদী এবং নবগৌরাঙ্গী সম্প্রদায়

রাধাকৃষ্ণ হলেন অদ্বয়তত্ত্ব। লীলা-রস আস্বাদন বা বিলাসের জন্য অনেক সময় দুই মূর্ত্তি ধারণ করেন।

"রাধা-পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ-যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে-যৈছে কভু নাহি ভেদ।
রাধা-কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥"

(চৈ. চ. আদি. ৪/৯৬ -৯৮)।

উপরোক্ত শ্লোকসমূহের তাৎপর্য হল এই যে পূর্ণ শক্তিস্বরূপ শ্রীরাধা এবং পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ-এই দুইজন একই। আবার প্রয়োজনে একে দুই হন। অনাদিকাল থেকে এই দুই বিগ্রহ স্বরূপত অভিন্ন হয়েও লীলারস আস্বাদনের জন্য দুইদেহ ধারণ করেন। দুই দেহ এক হলে শ্রী গৌরস্বরূপ। এটি হল ভাবের লীলা। ভাব আস্বাদনের জন্য দুই এক হয়ে যান। আবার যখন তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রস আস্বাদনের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা জাগে তখন তাঁরা হন শ্রী

রাধাকৃষ্ণরূপে দুই বিগ্রহ। উভয় লীলাই যুগপৎ নিত্য। এই লীলাই গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদের আসল স্বরূপ।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত না মেনে একশ্রেণীর লোক শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের কিছু শ্লোকের সঠিক অর্থ এবং তাৎপর্য না বুঝে যুক্তি দেন যে ঈশ্বর তত্ত্ব বলতে একমাত্র চৈতন্য তত্ত্ব বুঝায়।

"একলা ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্ত ভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥

(চৈ. চ. আদি ৭/১০)।

"এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য, জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব, –তাঁর সেবাকানুচর ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ–চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব,–তাঁহার কিঙ্কর ॥"

(চৈ. চ. আদি ৬ / ৮১–৮২)।

আবার শ্রীগৌর হরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতরণ করেন। কিজন্য করলেন? না, জীবকে প্রেম-ভক্তি শিখানোর জন্য। কিরূপে আসলেন? **"রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি।"**

সুতরাং দেখা গেল শ্রী গৌরহরি হলেন রাধাকৃষ্ণের যুগল–মূর্ত্তি। এই যুক্তি দেখিয়ে একদল লোক তাই বললেন, শ্রী গৌরহরি কৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁর মধ্যেই রাধা ও কৃষ্ণ বিরাজমান–অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান যুগপৎভাবে শ্রীগৌরহরির মধ্যে বিদ্যমান। কাজেই শ্রী গৌরহরি আবির্ভূত হওয়ায় আর রাধাকৃষ্ণের উপাসনার প্রয়োজন নেই। এই হল গৌরবাদীদের মূল কথা।

গৌরবাদীদের মূল বক্তব্য শ্রী শ্রীচরণদাসের **তত্ত্বরসামৃত জ্ঞানমঞ্জরী** নামের একটি বইতে পাওয়া যায় ঃ

"বৃন্দাবন ব্রজবাসী কৃষ্ণে সেবা কৈল। বাঁশী বাজাইয়া কৃষ্ণ বাঞ্ছা পুরাইল ॥ মনুষ্য আকারে কৃষ্ণ ছিল বৃন্দাবন। মানবের মত ছিল তাঁর আচরণ ॥ মূর্ত্তি নাহি কথা কহে, বাঁশী না বাজায়। মানুষের মত কার্য্য কিছু নাহি তায়। বৃন্দাবন হতে কৃষ্ণ যায় নবদ্বীপে। জানিয়া শুনিয়া তবু ভাবে নানারূপে ॥ কলিকালে সে প্রকার কৃষ্ণ রূপ নাই। তুব কেন কৃষ্ণ মূর্ত্তি

পুজয়ে সবাই ॥ কৃষ্ণ কোন দেবতার মধ্যে কভু নয়। মন্ত্র -পুজা সেবাদিতে কৃষ্ণ না আসয় ॥ আকৃতি-প্রকৃতি কৃষ্ণ মানবের রূপে। কলিতে মনুষ্যরূপে আছে নবদ্বীপে ॥ মানুষের মধ্যে কৃষ্ণ বর্তমান রয়। তাহা না চিনিয়া মূর্ত্তি সেবাদি করয় ॥"

– অর্থাৎ কলিকালে কৃষ্ণ সেবার আর প্রয়োজন কি? কৃষ্ণরূপী গৌরহরি মনুষ্যরূপে নবদ্বীপে অবতরণ করেছেন। তাই তাঁর সাধন-ভজন করলেই যথেষ্ট, পৃথকভাবে আর কৃষ্ণসেবার প্রয়োজন নেই। এই মত নিশ্চিতভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিরোধী বলা যায়।

যারা শ্রীগৌরকে মানেন কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণকে মানেন না, তাদের বিচার অদ্ধ কুক্কুটীর মত। একটি কুক্কুটি–অর্থাৎ মুরগীর অর্ধেক অংশ প্রাচীন এবং অন্য অংশ নবীন হতে পারে না। এরূপ বিচার করলে পুরা কুক্কুটিকেই অবজ্ঞা করা যায়–অর্থাৎ এরূপ গোঁজা মিলের বিচার কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌর অভিন্ন। তাই তাদেরকে প্রাচীন ও নবীন হিসাবে বিবেচনা কোনক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না। এই জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন ঃ

"একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
অদ্ধ কুক্কুটী ন্যায় তোমার প্রমাণ ॥
কিংবা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষন্ড।
একে মানি, আরে না মানি, –এই মত ভন্ড ॥"

(চৈ. চ. আদি ৫/১৭৬–১৭৭)।

গৌরীবাদীরা একসময় কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যান। এদের থেকেই নবগৌরাঙ্গবাদের উদ্ভব হয়। এই নবগৌরাঙ্গীবাদীরা মনে করেন যে শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কিছু উপদেশ রয়েছে যেগুলো সংকীর্ণ। তাই এসব উপদেশের প্রসারণ এবং পুনঃ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে তারা শ্রী গৌরাঙ্গের পুনঃপুনঃ অবতার কামনা করেন। অর্থাৎ বার বার ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতার হয়ে তিনি তাঁর পূর্বের উপদেশসমূহের সম্প্রসারণ এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন–এই হল নবগৌরাঙ্গবাদীদের মূল বক্তব্য।

একসময় ভারতের বর্ধমান, হুগলী, কলকাতা, নবদ্বীপ এবং তৎকালীন পূর্ববঙ্গের পাবনা, সিলেট ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন নবগৌরাঙ্গবাদী দলের সৃষ্টি

হয়। এক একটি দল এক এক জনকে গৌরাঙ্গের অবতার বলে মনে করে ঐ ব্যক্তির উপাসনায় নিয়োজিত হয়। এই ভিন্ন ভিন্ন নবগৌরঙ্গবাদী দল নিজ দলের স্বার্থ না থাকলে অন্যদলকে সহায়তা ও সহযোগিতা করে না। এদের মধ্যে কেউ কেউ বৈষ্ণবদের মতই কীর্ত্তন করে। আবার অন্যেরা বেদান্ত এবং সাংখ্য দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে জ্ঞানমার্গে বিচরণের চেষ্টা করে। অন্যান্যদের মধ্যে আবার কেউ কেউ কৃত্রিম অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে বিকৃত থেকে আত্মহারা ভাব দেখান। এরা মহাপ্রভুর গম্ভীরা লীলা অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বিকৃত আচারে লিপ্ত হয়। এজন্য দেখা যায় কিছু অসাধুলোক নিজের প্রতিষ্ঠার আশায় এবং কেউবা গৌরাঙ্গের অবতার হওয়ার লক্ষ্যে এবং লোভে এরূপ অপসম্প্রদায়ে প্রবেশ করে। প্রকৃতপক্ষে এরা শ্রীগৌরহরির বিদ্বেষী মাত্র।

নিত্য কৃষ্ণলীলার অনুকরণে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় কাল্পনিক নাগরীভাব এই সম্প্রদায়ের কারো কারো মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে জড়-দৃষ্টিতে বিবেচনা করে দুর্নীতি মনে করে। এই কারণ উল্লেখ করে এসব লোক শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রকে পুত পবিত্র বলেন। এদের মতে শ্রীকৃষ্ণ লীলায় যৌনতার ছোয়াচ আছে– যৌনরসাত্মক বিষয় এবং দৃষ্টিভঙ্গী আছে। অথচ শ্রীগৌর কখনো স্ত্রী-সঙ্গী ছিলেন না, বরং মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। স্ত্রী-সংসর্গ সব সময় এড়িয়ে চলতেন। এককথায় এদের মতে শ্রী গৌরহরি শ্রীকৃষ্ণের মত স্ত্রী-সঙ্গী ছিলেন না।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরহরির চরিত্রের এই ভিন্নতা কল্পনা করে তারা প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ লীলার অপ্রাকৃত মহারস বর্জন করেন। শ্রীকৃষ্ণ লীলার প্রকৃত রস আস্বাদনের মন, ও ক্ষমতা এদের নেই। তাই এরা শ্রীগৌরাঙ্গকেই একমাত্র শুদ্ধ মনে করেন। কিন্তু এই করতে গিয়ে এসব লোক আসলে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রী গৌরহরির বিশুদ্ধ প্রেম থেকে বিচ্যুত হয়ে শেষ পর্যন্ত জড়-কামের অধীন হয়ে পড়ে। এই সম্প্রদায়ের কিছু লোক **শ্রী চৈতন্য ভাগবতের** কতিপয় শ্লোকের বিকৃত অর্থ উপস্থাপন করে থাকেন। এছাড়া এদের ২/১ খানা বাংলা পুথি এবং নিজেদের রচিত কিছু গান আছে যেগুলোতে বৈষ্ণব সদাচারের বিকৃত উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়।

৫ কিশোরী ভজন সম্প্রদায়

বাউল এবং সহজিয়া অপ-সম্প্রদায়ের মত এবং পথের এক জগাখিচুরী হল কিশোরী-ভজন সম্প্রদায়। এরা রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত পরকীয়া রসকে জড়-দৃষ্টিতে বিবেচনা করে প্রকৃতি (স্ত্রী সঙ্গী) নিয়ে সাধন-ভজন করে। বৈষ্ণব রীতি বিরুদ্ধ তান্ত্রিক আচার অবলম্বন করে এই মতবাদ উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি (স্ত্রী সঙ্গী) মাত্রকেই এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐশী-শক্তিজ্ঞান করে। এখনও বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে তথাকথিত কিছু সাধু-সন্ত এবং মন্ত্র ব্যবসায়ী ও যৌন সংসর্গে আগ্রহী কিছু গুরু এরূপ দুনৈর্তিক ভজন-প্রক্রিয়া সমর্থন করেন এবং তদীয় শিষ্য-শিষ্যারা তাই নির্বিবাদে মেনে নেন।

এই কিশোরী ভজারা **শ্রী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু** এবং **শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের** কতিপয় শ্লোকের অপব্যাখ্যা করে তথাকথিত স্বকীয়া এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরকীয়া সাধনে লিপ্ত হয়। তারা ভক্তিরসামৃত সিন্ধু থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটিকে তাদের আচরনের সপক্ষে প্রমাণ দেয়ার অপচেষ্টা করে ঃ

"বাচা সূচিত শৰ্ব্বরীরতিকলা প্রাগলভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিত লোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখী নামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহ চিত্র কেলিমকরী পান্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়নকুঞ্জে বিহারং হরি ॥"

– অর্থাৎ রাত্রিতে রতিক্রিয়া চাতুর্যের প্রকাশকারী বিনাসঙ্কোচে বাক্‌পটুতায় শ্রীরাধাকে সখীদের সামনে লজ্জায় আড়ষ্ট নেত্রাকরে তার পীন স্তনদ্বয় বিচিত্র আলপনায় চিত্রিত পূর্বক পরাকাষ্ঠা দেখান এবং কুঞ্জে মিলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের কৈশোর বয়সকে সফল করেন।

আবার কিশোরী ভজনবাদীরা **শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত** থেকেও নিম্নোক্ত শ্লোকগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা করে আত্মতৃপ্তি লাভের পাশাপাশি নিজেদের আচার-আচরণকে সঠিক বলে যুক্তি প্রদর্শন করেন ঃ

"এই মতে পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্যাস চৰ্ব্বন ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥

তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে, আমি হই রসের নিদান ॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ॥
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি–শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।"

(চৈ. চ. আদি ৪/১১৯–১২৪)।

বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে শ্লোক উদ্বৃত করে সেগুলোর বিকৃত ব্যাখ্যা করে কিশোরী ভজনবাদীরা যুক্তি দেন যে সব রস থেকে শৃঙ্গার রস অধিক মাধুর্যময় হেতু রাধাকৃষ্ণের লীলার মত জড়দেহেও এরূপ রস আস্বাদন করলেই প্রকৃত সাধন ভজন হতে পারে। অথচ ব্রজলীলার রস হল অপ্রাকৃত। জড়দেহকে কেন্দ্র করে এরূপ রস আস্বাদনের চেষ্টা যৌনতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এজন্যই শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তদের নিম্নোক্তভাবে সাবধান করে দিয়েছেন ঃ

"অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া রূপে দ্বিবিধ সংস্থান ॥
পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
ব্রজবধুগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥
প্রৌঢ়-নির্ম্মলভাব প্রেম সর্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস –আস্বাদ কারণ॥"

অথচ এরপরও কিশোরী ভজারা বলেন ঃ

"রত্নবেদী রত্নসিংহাসনে কিশোর-কিশোরী বিরাজ করেন। চারদিকে নতুন নুতন রঙ্গিনীর গীতবাদ্য দ্বারা সর্বদা মুগ্ধ-বিহ্বল। একের কামরতি। তিনিই সৎ ও নিত্য সিদ্ধ। সহজ মানুষ তখন রসের কামনা করেন। দুই গুন। যখন এক হয়ে পান করেন তখন গুণহীন নিত্য। সে সময় কখন? প্রকৃতি-

পুরুষে জড়িত থাকে যখন। তাকে লাভ হবে কিসে? তার স্বরূপ হলে। সেটা হবে কিসে? শ্রীগুরুর উপদেশে। গুরুর উপদেশ কেমন? কামগায়ত্রী ও কামবীজ। কামগায়ত্রী হল কামবীজ, নায়িকা কামগায়ত্রী।"

"রসের তরঙ্গে পড়ি নাহি জানে আন
রসেতে মগন সদা করে রস পান ॥
রস পান করি করি সেই যে পাইবে।
রসের মরম জানি প্রভুকে ভজিবে ॥
প্রভুর সঙ্গে সখি হয়ে আসিবে যেই জন।
অবশ্য পাইবে সে নিত্য বিন্দাবন ॥ "

[উৎস ঃ বৈষ্ণব তন্ত্রম ঃ সংকলন ও অনুবাদ, শ্রীপরাশর]

কিশোরী ভজাদের তথাকথিত গুরুদের মধ্যে যারা চালাক-চতুর তারা কেউ কেউ কিশোরী ভজনের সপক্ষে **বিষ্ণু পুরাণের** পর্যন্ত উদ্বৃতি দিয়ে থাকেন ঃ

"সোহপি কৈশারকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতাঃ ॥"

– অর্থাৎ শ্রী মধুসূদন কৃষ্ণ শরৎকালের রজনীতে গোপীকুল শিরচূড়া। তাঁদের মধ্যে অবস্থান করে অনেক নিশি সূরত কেলি করে নিজ কৈশোর বয়সকে পূর্ণানন্দে ভরপুর করেছেন বলেই জগতের অমঙ্গলকারী দানবদেরকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই যুক্তিতে তথাকথিত কিছু গুরু বলেন যে কিশোরী–ভজন করলে–অর্থাৎ কিশোরীরূপ স্ত্রী-সঙ্গীর সাথে যৌন সঙ্গম করলে চিত্ত চাঞ্চল্য দূর হবে এবং তাতে সাধন-ভজনের পথের মূল বাধা দূর হয়ে যাবে। কি স্পর্ধা এদের–পাঠকগণ ভেবে দেখুন!

এইসব কিশোরী ভজারা কিশোরী চরণেই গয়া-গঙ্গা-কাশী বিরাজমান আছে বলে মনে করেন। শুধু তাই নয় এরা গয়াধামে পিতৃ পিন্ডদানকে বৃথা মনে করে। এমনকি শ্রী হরিবাসর একাদশী ব্রতকে পর্যন্ত অবহেলা করে। তারা মনে করে কিশোরী ভজনেই সব ফল পাওয়া যাবে। আর এই তথাকথিত ভজন মানেই স্ত্রী-সঙ্গীর সাথে সবার অগোচরে যৌন-সংসর্গ করা। এজন্যই দুর্নীতিপরায়ন কিছু কিশোরী ভজাকে গাইতে দেখা যায় ঃ

"কিশোরী চরণে গয়া-গঙ্গা কাশী।
বৃথা পিন্ডদান বৃথা একাদশী ॥
কর আত্মারই মিলন অজপা উদ্দেশী।
আমি তুমি ভেদ না কর কখন ॥
অধরে অধর করিয়া মিলন।
অধরামৃত রস কর আস্বাদন ॥
প্রেম ভরে কর গাঢ় আলিঙ্গন।
দেখা যেন শশী না হয় পতন ॥"

উপরোক্তভাবে কিশোরী ভজারা স্বকীয়া-এবং পরকীয়া সাধনে লিপ্ত থাকে। এরা মাঝে মধ্যে গভীর রাতে আবদ্ধ ঘরে মিলিত হয়। এরপর নিজ স্ত্রী অথবা অন্য নারী বরণ করে মিলিত হয়। এদের মধ্যে এমন যৌনাচারও আছে বলে শুনা যায় যে তথাকথিত গুরু অথবা গুরুর অবর্তমানে জৈষ্ঠ্য গুরুভাই কিশোর রুপে নিজেকে ঘোষণা করে। তারপর স্ত্রী সঙ্গীদের মধ্যে যার রূপলাবণ্য সবচেয়ে বেশি তাকে কিশোরী রাধা রূপে বরণ করে নেয়। এরপর অন্য স্ত্রী সঙ্গীরা গোপী সাজে সজ্জিত হয়ে কিশোর কিশোরী রূপী গুরু-শিষ্যা যেন রমন রসে লিপ্ত হতে পারে তার সর্ববিধ ব্যবস্থা করে দেয়। এক্জন বৈষ্ণব এর কাছে শুনেছি যে এদের মধ্যে এমন গুরুও আছেন যিনি শিষ্যাদেরকে বলে থাকেন ঃ **"আমি শ্যাম তুমি রাধা।"** এই নীতি বিহর্গিত এবং বৈষ্ণবাচার বিরুদ্ধ কথা বলে অনেক সময় এই অপসম্প্রদায়ের তথাকথিত গুরুনামধারী ব্যক্তিরা সুন্দরী-যুবতী শিষ্যাদের সাথে যৌনাচারে লিপ্ত হয়। যুক্তি দেয় রাধাকৃষ্ণের মিলনের রস এর দ্বারা অনুভব করা যাবে। শিষ্যা সরল মনে তাই মেনে নেয় বা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

বেশীরভাগ কিশোরীভজা জাতপাত স্বীকার করে না। নরনারী একত্রে নিভৃত স্থানে মিলিত হয় এবং একত্রে উপরের সঙ্গীত গায় এবং প্রসাদ পায়।

কিশোরীভজাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ নিজেদের মত করে নীচের সঙ্গীত গায়।

"বৃন্দা আসি শ্রীরাধারে বাহু ধরি কয়।
রাধাকুঞ্জের ধারে নৃত্যশিক্ষা কৃষ্ণ যে করয় ॥
কৃষ্ণ কন সখীদের রাধা মোর সর্বময় গুরু।

তার আদেশ ভঙ্গীতে হইল আমার শিক্ষা গুরু ॥
শ্রীমতির নাচ দেখি বিহ্বল কানু-দৃষ্টি বিস্ময়।
আমিও তার মত হব জানো সব মুঁই রাধাময় ॥"

উপরোক্ত সঙ্গীতের বিকৃত ব্যাখ্যা করে কিছু কিছু কিশোর ভজনবাদী বলেন যে কিশোরীর নৃত্য দেখে কানুরূপ শ্রীকৃষ্ণ মোহিত হয়ে নিজেও রাধার মত নৃত্য করার জন্য রাধাকুঞ্জে নৃত্য শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। কারন রাধার সাথে তাকে যে একই তাল এবং লয়ে নৃত্য করতে হবে! তা না হলে কিশোররূপী শ্রীকৃষ্ণ কিশোরী রাধার মন যোগাবে কি করে? কিশোর যে কিশোরীময়! তা না হলে সাধন ভজনে কিশোর-কিশোরী নিজেরা সেজে নৃত্যগীত গেয়ে বড়ু চণ্ডীদাসের মিলনাত্মক বিকৃত কাম-বাসনা চরিতার্থ হবে কি করে! বলি হারি! কিশোর-কিশোরীর শুদ্ধ নিত্য লীলাকে কিভাবে জড় কামনা বাসনায় এরা রূপান্তর করে! পরমাপ্রকৃতির (শ্রীমতি রাধিকা) সাথে পরম পুরুষের (পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) লীলাই বৈষ্ণবের আরাধ্য।

"কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় -কায়।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥"

(চৈ.চ. আদি ৪/৭১)।

বলা হয় যে রাধা ভাব না আসলে কোন বৈষ্ণবই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারেন না। কিন্তু রাধাভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মঞ্জরীতে রূপান্তর করতে হবে। মনে মনে সদা সর্বদা ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে–

"গোবিন্দানন্দিনী রাধা, গোবিন্দ মোহিনী।
গোবিন্দ সর্বস্ব, সর্বকান্তা–শিরোমনী ॥"

(চৈ. চ. আদি ৪/৮২)।

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে–

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥"

–অর্থাৎ শ্রীমতি রাধিকা হলেন দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, সম্মোহনী ও পরা। কৃষ্ণের সকল প্রকার বাঞ্ছা শ্রীমতি রাধিকা পুরণ করেন। সর্ব্বকান্তি শব্দের অর্থ হল এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে মোহিত করেন। আর তাঁর মোহিনী হলেন শ্রীমতি রাধিকা। এই অর্থে রাধিকা হলেন সব কিছুর

পরা ঠাকুরানী। তিনি কৃষ্ণময়ী। কারণ তাঁর ভিতর এবং বাহির সর্বত্রই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত। এজন্য তিনি যাই দেখেন না কেন সবকিছুতেই কৃষ্ণকে অবলোকন করেন। তিনি সর্বপালিকা, সর্বজগতের মাতা, সর্বপুজ্যা, পরমদেবতা ॥

"কৃষ্ণময়ী–কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥"

(চৈ. চ. আদি ৪/৮৫)।

অথচ এহেন কৃষ্ণ এবং রাধার যুগল-কিশোর মিলনকে জড়-দৃষ্টিতে বিবেচনা করে কিশোরী ভজনবাদীরা বলে থাকেন–

"কিশোরী পূজন কিশোরী ভজন
কিশোরী গলার হার।"

কিশোরী ভজনের রীতিতে বৈষ্ণব রীতি বিরুদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক-আচারের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে বলা যায়। প্রাক-চৈতন্যযুগের চণ্ডীদাস (ইনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের চণ্ডীদাস নন) সহজ সাধনের অনেক রাগাত্মিকা পদ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি হল ঃ

"পুরুষ-প্রকৃতি দোঁহে এক রীতি
সে রতি সাধিতে হয়।"

আবার **"প্রেমানন্দ লহরী"** নামক এক সহজিয়া পুথিতে আছে–

দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় তবে।
দোঁহার মন ঐক্যভাবে ডুবি এক হয়।
তবে সে সহজসিদ্ধ জানহ নিশ্চয় ॥"

অন্যদিকে **"সহজিয়া রতিমঞ্জরী"** নামে হাতে লেখা এক পুঁথিতে আছেঃ

"মন-প্রকৃতি দেহ পুরুষ সাধন যখন করিবে।
রাধা-রমন ভাব বুদ্ধি সিদ্ধ দেহতে রহিবে ॥"

প্রকৃতি শরীরের (স্ত্রী–শরীরের) বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানসমূহের স্পর্শ এবং চোখের দ্বারা দর্শন দৈহিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। স্পর্শ, চুম্বন, দর্শন, লেহন, চোষণ ইত্যাদিকে সহজিয়া বাউল তন্ত্র শাস্ত্রে বলে **"হিল্লোল"**। আর এই হিল্লোল বৃদ্ধির জন্য দরকার বিন্দু সাধনা। বিন্দু সাধনা করতে হলে

দরকার প্রাণায়াম–অর্থাৎ দেহস্থিত বিভিন্ন বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে বীর্য স্তম্ভন করতে হবে। তাহলেই পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার লীলা অনুভব করা সম্ভব হবে। শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী তার **"রাধা-তন্ত্রম"** গ্রন্থে নবদ্বীপ মায়াপুর নিবাসী শ্রীগোপী বল্লভ দাস নামে এক গোঁসাইজীর কাছে রক্ষিত এক পুথির উল্লেখ করেছেন যাতে বৈষ্ণব সদাচার বিরুদ্ধ অনেক পদের মধ্যে নিম্নোক্ত পদগুলি অত্যন্ত গর্হিত হলেও কিশোরী ভজনবাদীদের মধ্যে যারা তান্ত্রিক আচারে বিশ্বাসী তাদের কাছে আদরণীয়

"প্রকৃতি পুরুষে মিলন মানে রজঃবীজের মিলন।
নিবিড় আনন্দঘন রস স্বরূপ যাহা না যায় লিখন ॥
নিরন্তর শৃঙ্গার লীলা করিবে যে সাধক সুখে।
নিরন্তর বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার লীলা আসিবে মুখে ॥
এই শৃঙ্গার রস লীলার আনন্দ অপার।
যাহা নিত্যকাল ধরি হয় এই যমুনার পার ॥"

....

রাধাকৃষ্ণের রমনভাব ভগবান ভাবনা মাত্র।
প্রকৃতি-পুরুষে পূরিলে 'সহজ মানুষ' যা বলে শাস্ত্র ॥"

এরপরই তথাকথিত বিন্দু সাধনাকে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত মহাপ্রভুর একটি উক্তির সাথে অত্যন্ত গর্হিতভাবে তুলনা করা হয়েছে–

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাতে ॥
সেইভাবে বীজকে বাহির না করিহ রজঃ হতে।
প্রকৃতি ছাড়ি পুরুষ কখন না যাবে কোথাতে ॥"

কি জঘন্য তুলনা! এরাই প্রকৃতপক্ষে মহাপাষণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষী ও **শ্রীগৌর বিদ্বেষী।** সুতরাং দেখা গেল কিশোর ভজনবাদীরা সর্বদিক থেকেই বৈষ্ণব সদাচার বিরোধী। প্রকৃত ভক্ত এবং বৈষ্ণবগণ অবশ্যই এরূপ তান্ত্রিকভাবাপন্ন কিশোরী ভজনবাদীদের সঙ্গ করবেন না। প্রয়োজন হল এদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা।

৬ আউল–বাউল সম্প্রদায়

ক. আউল সম্প্রদায় আউল শব্দটি আর্ত্ত বা আতুর শব্দ থেকে এসেছে। এই মত সহজিয়াবাদের ভিন্নরূপ এবং আকার বলা যায়। এদের বিচার হল সব ধরনের সাধনের উদ্দেশ্য একই। বিরোধ বা পার্থক্য শুধু ব্যবহারিক দিক থেকে। তাই সাধকমাত্রেই তা পরিত্যাগ করা উচিত। এদের মতে বেদাদি শাস্ত্র কল্পিত–গুহ্য নয়। মন যা কামনা করে তা করাই উত্তম।

আউলগণ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ দোষবহ করেন না। জীবনকে উপভোগ করাও এক ধরনের বিশেষ ধর্ম মনে করেন। তারা বৈধ-অবৈধ বহু স্ত্রীর-সঙ্গ করাকে বাধা মনে করে না। বাইরে এদের বৈরাগীর বেশ থাকে। আবার অনেকে দাড়ি ও চুল বড় রাখেন। কিছু কিছু বৈষ্ণব আচার ও রীতি নীতি অনুকরণের অভিনয় এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। খুব সম্ভবতঃ আউলদের এরূপ আচরনের উৎস **"ছান্দোগ্য উপনিষদ"** এর কিছু শ্লোকের বিকৃত ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভব হতে পারে। এই উপনিষদের একস্থানে রয়েছে ঃ

"স য এবমেতদ্ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্
বেদ, মিথুনী ভবতি, মিথুনান্মিথুনাং প্রজায়তে
সর্ব্বমায়রেতি জ্যোগ জীবতি মহান প্রজয়া
পশুভির্ভবতি মহান কীর্ত্ত্যা, ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্‌ব্রতম্"

–অর্থাৎ যিনি এই রকম পুরুষ মিথুনে বামদেব্য সামকে প্রকৃত অবগত হয়ে আরাধনা করেন, তিনি সর্বদা মিথুনীভাবে বিরাজ করেন। কখনো তাঁর ঐ ভাবের বিচ্ছেদ হবে না। আর তার এই মিথুনীভাব সন্তান সঞ্জাত হয়ে থাকে। তিনি পরিপূর্ণ দীর্ঘায়ু হন। তার জীবন সর্বদা সমুদ্ভাসিত থাকে। সন্তান সৃষ্টির কীর্ত্তির মাধ্যমে তার মহিমা প্রকাশ পায়। তিনি সমাজে বরণীয় হন। সমাসমার্থিনী কোন নারী শয্যায় উপস্থিত হলে সে পুরুষ তাকে বর্জন করবেন না।

তান্ত্রিক মতে বিশ্বাসী আউলদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে যথার্থ উপাসনা ভাবে পরপত্নী বিলাসে ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ হয় না। এটাকে মহাব্রতই বলা যায়। এতে শাস্ত্রের কোন ক্ষতি হয় না। কথিত আছে উড়িষ্যার এক সময়ের রাজকন্যা লক্ষ্মীম্বরা তন্ত্র সাধিকা ছিলেন। তিনি তার **"অদ্বয় সিদ্ধি"** গ্রন্থে

বলেন ঃ "দেহের পুজা ও ধ্যান করবে। দেহের সুখই বিরাটের সুখ ও আনন্দ হয়। তাই দেহ সুখ থেকে বঞ্চিত হবে না। সে সুখের মধ্যে আবার যোষিৎ থেকে যে আনন্দ সেই আনন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য যোষিৎ বিষয়ে কোন জাত-বিচার নেই। এক বা দুই পুরুষ ও নারীতে লিপ্ত না থেকে বহু বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে মিলনে দোষ নেই।"

আউলদের মধ্যে আবার একদল রয়েছেন যারা জ্ঞান-মার্গী। জ্ঞানমার্গী আউল হিসাবে **কামদেব নাগর, আগল-পাগল ও শঙ্করের** নাম পাওয়া যায়। পূর্বে এরা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পূর্বে যখন বিশেষ কারণে জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিতেন, তখন তাঁর শিষ্যদের কয়েকজন উক্ত শিক্ষাকে শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি যখন ভক্তিযোগই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করতে আরম্ভ করেন তখন এসব ব্যক্তি তার কথা গ্রহণ করলেন না। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বার বার নিষেধ সত্ত্বেও এরা পূর্বের মত ত্যাগ না করাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ থেকে বিতাড়িত হন।

এদের মধ্যে আবার **শংঙ্কর** ছিল অতি গোড়া। অসমীয় এক গ্রন্থে পাওয়া যায় আসামের নওগাঁও জেলার অন্তর্গত বরদোয়া গ্রামে কুসুম্বর ভূঞার ঔরসে সত্য সন্ধার গর্ভে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহেন্দ্র কন্দলীর কাছে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং কিছুটা বড় হয়ে তাঁকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে তৎকালীন বঙ্গদেশে আসেন। এই শঙ্কর ঘটনাক্রমে শ্রী অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য হন এবং প্রথমে জ্ঞানমার্গের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। "ভক্তিসন্দর্ভ" গ্রন্থে (বহরমপুর সংস্করণ) বর্ণিত আছে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পরবর্তীতে জ্ঞানমার্গ বাদ দিয়ে ভক্তিমার্গের পথ অনুসরণের উপদেশ নিজ শিষ্যদের প্রদান করলে এই শঙ্কর সবচেয়ে বেশী প্রতিবাদ করেন এবং জ্ঞানমার্গ ছাড়তে অস্বীকার করেন। ফলে অদ্বৈত প্রভু তাকে শিষ্য থেকে ত্যাগ করেন।

"অদ্বৈত আচার্যের শাখা শঙ্কর নামেতে।
জ্ঞানপথে তার নিষ্ঠা হৈল ভালমতে ॥
অদ্বৈত শঙ্কর প্রতি কহে বারে বারে।
মনোরথ-সিদ্ধি মুঞি কৈনু এ প্রকারে ॥
ছাড় ছাড় ওরেরে পাগল! নষ্ট হৈলা।
তেহ না ছাড়ে, তাহে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা ॥

মহাবহির্মুখ বীজ করিল রোপণ।
ক্রমে বৃদ্ধি হবে জানিল বিজ্ঞগণ॥ "

(ভক্তিসন্দর্ভ ঃ ২২/১৯৮৫-৮৮)।

এই শঙ্কর জ্ঞানবাদে মত্ত হয়ে এতটা গর্বিত হয়ে পড়েছিল যে শ্রী অদ্বৈত প্রভু ভক্তিবাদের পথ অনুসরণ করতে উপদেশ দেয়ায় নিজের গুরুকেই বিচারে বসার জন্য আহ্বান করে বসেছিলেন। তার এই অসদাচারে বিরক্ত হয়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাকে **বাউল** বলে আখ্যায়িত করে বলেছিলেন যে শঙ্কর এবং তার সহযোগীদের মতের অনুসারীরা আউল বলে পরিচিত হবে।

"অদ্বৈত বোলে তোমরা জ্ঞানবাদ ছাড়।
শঙ্কর বোলে–বিচারে পরাজিত কর ॥
অদ্বৈত বোলে–শঙ্কর তুমি হইলে বাউল।
তোর মতে লোক সব হইবে আউল ॥

(উৎস ঃ শ্রী শ্যামলাল গোস্বামী ঃ প্রেম সম্পূটন)।

শ্রী অদ্বৈত প্রভু ক্রোধভরে শঙ্করসহ অপরাপর গুরুদ্রোহী শিষ্যদেরকে পরিত্যাগ করেন। এই জ্ঞানমার্গিরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ থেকে বিড়াড়িত হয়ে দেশান্তর হয়ে যায়। এরা এবং এদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ অনেক স্থানে অবস্থান করে জ্ঞানমার্গের ভিত্তিতে বৈষ্ণবধর্ম ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। কিন্তু এরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত নন, বরং বৈষ্ণব নামের একটি অপসম্প্রদায় মাত্র।

খ. বাউল সম্প্রদায় বাউল সম্প্রদায়ীরা মনে করেন যে পরম উপাস্য তত্ত্ব রাধাকৃষ্ণ হলেও তা জীবের স্থূলদেহের মধ্যেই বিরাজ করে। এই উপাস্য পদার্থ (রাধাকৃষ্ণ) পাওয়ার জন্য নিজের শরীর ত্যাগ করে অন্য কোন জায়গায় যাওয়ার বা অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তা মানব দেহের ভিতরেই আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর (শিব), গোলোক বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ এই সব কিছুই এই স্থূল শরীরের মধ্যেই রয়েছে। এজন্য বাউলরা অনেক সময় বলেন ঃ

"যা নাই ভাণ্ডে (দেহের মধ্যে) তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।"

আবার বাউল মতে প্রকৃতির (স্ত্রী সঙ্গী) সাধন-ভজন করলে পরিপক্ক অবস্থায় (চূড়ান্ত পর্যায়ে) সাধকের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ রূপের দ্বৈতভাব থাকে না। তখন সাধকের কাছে পুরুষ বা স্ত্রী, জড় বা চিৎ ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য দূর হয়ে যায়। তিনি সমদর্শী (সমানভাবে ও সমানরূপে যিনি সবাইকে দেখেন ও ভাবেন) হয়ে যান। তাহলে কিভাবে হতে পারে এরূপ অবস্থা? অনাচারী বাউলদের মধ্যে য়ারা বিন্দু সাধনায় বিশ্বাসী (বিন্দু সাধনা হল পুরুষ কর্তৃক বীর্যস্তম্ভন করে তা সংরক্ষণ) তারা বলেন গুরুর কাছে এই শিক্ষা লাভ করতে হবে।

"গুরুর কাছেতে শেখ পূরক, কুম্ভক রেচক শিক্ষা।
বায়ু সুষম্না পথে চালায় দাও সাম্যবস্থার পরীক্ষা ॥
বৈদুর্যমনি দুর্লভ বিন্দু স্থৈর্য সাধিত করিবে।
এই বিন্দু উর্ধেতে টানিলে মূল সাধনা সিদ্ধ হইবে ॥
কুম্ভক শক্তির উপর বান ক্রিয়ার হয় নির্ভর।
মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন, সম্মোহন বলে তারপর ॥
এই পঞ্চবানের ক্রিয়া আছে মিলনতন্ত্রের শিক্ষায়।
বান পুরুষ বীর্য গুণ প্রকৃতি রতি–শেখ গুরুর দীক্ষায় ॥
মন-প্রকৃতি দেহ পুরুষ সাধন যখন করিবে।
রাধারমন ভাব বুদ্ধি সিদ্ধ দেহতে রহিবে ॥"

[উৎস ঃ শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রাধাতন্ত্রম্ পৃঃ ১৩৪]

উপরোক্ত পদসমূহ থেকে বুঝা যায় বাউলরা মনে করেন যে প্রকৃতির (স্ত্রী সঙ্গী) সাথে মিলনের সময় বীর্যপাত যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ পুরুষের কাছে বীর্য হল অমূল্য সম্পদ। আর তার জন্য দেহস্থিত বিভিন্ন নাড়ী ও বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযুক্ত গুরুর অধীনে প্রানায়াম শিক্ষা নিতে হবে। তাহলে দেহের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণের রমন সুখ আস্বাদন করা যাবে।

এখন কিভাবে প্রানায়ামের সাহায্যে দেহস্থিত দুই নেত্র এবং বিভিন্ন নাড়ীর সাহায্যে সম্ভোগ-রস আস্বাদন করা সম্ভব? অর্থাৎ কিভাবে পরিপক্ক বা পাকসিদ্ধ অবস্থায় (অর্থাৎ নিত্য আনন্দ অবস্থায়) পৌছানো সম্ভব? এর উত্তরে বাউলরা বলেন–

"এবে দেহে বৃদ্ধি কর স্পন্দন।
এবে দক্ষিণের পিঙ্গলা নাড়ী কিছু নিশ্বাস প্রশ্বাস কম্পন ॥
ডাননেত্রে দৃষ্টি দানি তা কর নিবদ্ধ।
বাম নাসিকায় কিছুক্ষণ শ্বাস কর বদ্ধ ॥
ইহাতে মদনের বামে ইড়ানাড়ী পাবে সাড়া।
মাদনের দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী হবে হারা ॥
বাম-দক্ষিণের কান্ডজ্ঞান নাহি আছে যার।
মাদন-মদনে সিদ্ধির তার কৈ অধিকার।
ইড়ানাড়ীর সাম্যবস্থা আর পিঙ্গলার চপল স্পন্দন।
কাম-বৃদ্ধি বিলাসই সর্বদা মহাভাবের চন্দন ॥
বামারাগ হয় অতি রসের কল্লোল।
দক্ষিণ রাগেরে বলি যথার্থ হিল্লোল ॥"

উপরোক্ত অবস্থায় তাহলে কি পাওয়া যাবে? অনাচারী বাউলরা বলেন–

"রাধাকৃষ্ণ কামরস যোগশাস্ত্রের অতি বড় তথ্য।
প্রকৃতি পুরুষ মিলন যোগসাধনা ঘোষে সেই তত্ত্ব ॥
মাদন-মদনে মানব-মানবী মহামহিমা গীত গায়।
অপার আনন্দসাগরে সাঁতার সুখ যা বলন না যায় ॥"

[উৎস ঃ ঐ পৃঃ ১৩৫–১৩৬]

শ্রীলোচনদাস গোসাঞি এর **"বৃহৎ নিগম গ্রন্থ"**–তে উপরোক্ত ভাবকে বলা হয়েছে **"সাগর তরঙ্গে অগ্নিশিখা"**। এর সারমর্ম হল মানব-মানবীর প্রেম সৃষ্টি করে রতি। রতির উদ্রেক হেতু জন্মে কাম। কাম থেকে মহাভাব। আর মহাভাব থেকে নিত্য আনন্দ। বাউলতন্ত্রে এই অবস্থাকেই **"পাকসিদ্ধ"** বলা হয়।

বাউলদের মধ্যে যারা সহজিয়া সাধনের পক্ষপাতি তারা বলেন প্রকৃতির (স্ত্রী) প্রকৃতিতত্ত্ব হল কারণ যাকে বলে মহাশক্তি। অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে মহাশক্তি রয়েছে। রাধা হলেন এই শক্তি। আর পুরুষ হলেন শক্তিমান (শ্রীকৃষ্ণ)। তাই শক্তি ও শক্তিমানের অবাধ মিলনই হল রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন। অর্থাৎ মানব-মানবীর অবাধ মিলন দ্বারাই রাধাকৃষ্ণের মিলনের সুখ অনায়াসে আস্বাদন করা সম্ভব।

দেহাভিমানী বাউলরা বলেন, প্রকৃতির অন্তরে সবসময় কামাগ্নি জ্বলছে **পুরুষের** নির্জিবতাকে উষ্ণ করবার জন্য। প্রকৃতির এই যে কামাগ্নি তার দ্বারা **পুরুষের বীজ** বস্তুটি **"চলৎ শক্তিময়"** রূপে থাকে। আর প্রকৃতি পুরুষের **মিলন** তথা মাদন-মদনের চূড়ান্ত রূপ হল নির্গুনতত্ত্ব। অর্থাৎ যার কোন ধ্বংস বা **সৃষ্টি** কিছুই নেই। আর তাই সহজিয়া পন্থার অনুসারী বাউলরা ধ্যানস্থ হয়ে চিন্তা করেন–

> **"নির্গুন মানুষ তত্ত্ব রসময় তনু।**
> **তাহার আশ্রয়-এ রহে যে বর্তমান ভানু ॥**
> **ভানু সঙ্গে সূর্য বলি দ্বাদশ আদিত্য।**
> **সেই সর্ব রাত্রি হয় বর্তমান নিত্য ॥**
> **ভানু বলি বার মাসে উদয় যে হয়।**
> **নায়িকার দেহে বর্তমান রয়।**
> **সাক্ষাৎ স্বরূপ ব্রজে–বৃন্দাবন হয়।**
> **দ্বাদশ আদিত্য সম তাহাতে উদয় ॥**
> **[শ্রী লোচনদাস গোসাঞি ঃ বৃহৎ নিগম গ্রন্থ]**

নারীর প্রকৃতিতত্ত্ব বারো মাসে হয়– অর্থাৎ নারীর যুবতী বয়স অবধি সময়কে সহজিয়া মতের বাউলরা প্রকৃতি তত্ত্ব বলেন। যে বালিকা ঋতুমতি হয় নাই এবং যে নারীর স্বাভাবিক নিয়মে বয়সকালে ঋতুবন্ধ হয়েছে তারা কখনো প্রকৃতি তত্ত্ব হতে পারে না। আর এই জন্য কিশোরী ও যুবতীরাই অনাচারে অভ্যস্ত তথাকথিত বাউল সাধকদের সাধন-ভজন অর্থাৎ কামাচারের পাত্রী। তাইতো এদের মধ্যে অনেককেই চন্ডীদাসের সাথে তাল মিলিয়ে গাইতে শুনি–

> **"কিশোরী পূজন কিশোরী ভজন**
> **কিশোরী গলার হার ॥"**

সহজিয়া মতের অনুসারী বাউলরা মনে করেন দেহের মধ্যে যে সহস্রাধার আছে সেখানেই রাধাকৃষ্ণের রমনভাব অবস্থান করে। এজন্যই তারা বলেন–

> **"এই প্রকৃত লীলার স্থান সহস্রারে হয়।**
> **সহস্রদল শতদলে কভু তাহা না রয়।**
> **সেখানে সাধক স্বরূপ স্থির নিস্তরঙ্গময়।**
> **পুরুষসত্ত্বা প্রকৃতিসত্ত্বার মিলন ভূমারূপ পায়। "**

বাউলদের মধ্যে যারা সহজিয়া মতের অনুসারী তারা মনে করেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরকীয়াবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। একসময় পুরীধামে অবস্থানকালে মহাপ্রভুর কাছে এক অল্পবয়স্কা বিধবা ব্রাহ্মণ সুন্দরী মহিলা তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে প্রায়ই আসতেন। মহাপ্রভু ঐ ছেলেটিকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। একেই পুঁজি করে সহজিয়া-বাউলরা নিজেদের রচিত তথাকথিত **"চৈতন্য প্রেমতত্ত্ব নিরুপণ"** নামক এক পুথিতে বলেন–

"থাকুক অন্যের কাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।
স্ত্রীমূর্ত্তি স্পর্শন তিঁহো না করেন কভু ॥
বাহ্যেতে প্রকৃতি নিন্দে অন্তরে তন্ময়।
বিধবা ব্রাহ্মণীর সঙ্গে প্রয়োজন হয়। ॥

অথচ শ্রী চৈতন্যচরিতামৃতেই আছে যে মহাপ্রভু দামোদর পন্ডিত এর মুখ দিয়ে বলালেন–

"পন্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণের বালকে প্রীতি কেনে কর?
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥
তুমিও পরমযুবা পরম সুন্দর।
লোক কানাকানিবাতে দেহ অবসর ॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ৩/১৫–১৭)।

মহাপ্রভু তার পরম ভক্ত দামোদর পন্ডিতের অনুশাসনে অন্তরে সন্তোষ লাভ করলেন এবং হেসে বললেন–

"ইহারে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর–সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ।
তোমাসম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম না যায় রক্ষণে ॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ৩/১৯, ২৩)।

এরপরও কি বলা চলে মহাপ্রভু পরকীয়া সাধনে রত ছিলেন? যে মহাপ্রভু শিখি মাহিতীর কোন মাধবী দাসীর কাছ থেকে উত্তম চাউল চেয়ে আনার অপরাধে ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করেছিলেন তাঁর ক্ষেত্রে সহজিয়া বাউলদের

উপরোক্ত অপবাদ অমার্জনীয় অপরাধ বলা যায়। শ্রী চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়-

"প্রভু কহে,-বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পাঁরো আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরেপি মন ॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥"

এরপরও কিন্তু সহজিয়াভাবের বাউলরা ছাড়তে রাজী নন। পূর্বোক্ত **চৈতন্য প্রেমতত্ত্ব নিরুপণ** নামক এক পুথিতে বলেন-

"সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাভাগ্যবান।
যার গৃহে চৈত্যন্যের সর্ব্বানুসন্ধান ॥
ষাটি কন্যা ধন্যা সেই ব্রহ্মান্ড ভিতরে।
যাহাতে চৈতন্য চন্দ্র সদাই বিহরে ॥"

কি জঘন্য অপবাদ মহাপ্রভুর প্রতি! প্রকৃত সত্য এই যে সার্ব্বভৌম পন্ডিতের কন্যা ষাটির জামাতা অমোঘ চৈতন্য মহাপ্রভুর আহারের পরিমাণ দেখে ব্যঙ্গ করাতে সার্ব্বভৌম পন্ডিতের স্ত্রী বলেন যে বৈষ্ণবের নিন্দা করায় ষাটীর জামাতা মরে যাক্, ষাটী বিধবা হলেও দুঃখ নেই। তিনি ষাটীকে পতি-পরিত্যাগের জন্য পর্যন্ত পরামর্শ দেন। সার্ব্বভৌম পন্ডিতের গৃহে অবস্থান করায় তার মেয়ে ষাটীর সাথে মহাপ্রভুর সম্পর্ক থাকার-এরূপ অভিযোগ শুধু অমার্জনীয় অপরাধই নয়, সহজিয়া-বাউলরা কোটী কোটীবার ধিক্কার পাওয়ার যোগ্য।

বাউলদের মধ্যে কোন কোন উপসম্প্রদায়ে সাধনের অন্তর্গত **"চারিচন্দ্রভেদ"** নামে একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। চারিচন্দ্র হল দেহ থেকে নির্গত শুক্র (বীর্য), শোণিত (রক্ত), মল ও মূত্র-এই চারটি পদার্থ পুনরায় শরীরেই ধারণ করা উচিত। অন্য কথায় এসব ঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করাও এদের সাধনের অন্তর্গত। আবার ক্ষেত্র বিশেষে তথাকথিত **পঞ্চ-মকার** সাধনা করাও এদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

বাউলদের মধ্যে একশ্রেণী আছে যারা বলেন লোক সমাজে লোকাচার এবং গুরুর মধ্যে তাঁর মতের আচার আচরণ পালন করাই বিহিত বা সঠিক ধর্ম। এরা বৈষ্ণব হিসাবে পরিচয়দানের উদ্দেশ্যে লোক দেখানোর জন্য কিছু বৈষ্ণব আচার এবং তিলক ধারণ ও মালা পরিধান করেন। তারা কাঠের বা তুলসী মালার সাথে আবার রুদ্রাক্ষ বা স্ফটিকের মালাও পরিধান করেন। এ যেন এক জগাখিচুরি প্রক্রিয়া। এরা আবার বৈষ্ণবদের মতো গৈরিক বর্ণের কৌপিন বহির্বাস পরিধান করে। কিন্তু একই সঙ্গে মুসলমান ফকির-দরবেশদের অনুকরণে আলখেল্লার মত জামা পরিধান করেন।

এদের মধ্যে দাড়ি গোপ ধারণ ও মাথায় বড় বড় চুল ঝুঁটির আাকারে বেঁধে (খোপা বিশেষ) রাখার প্রথা আছে। কেউ কেউ সেবাদাসী রাখেন এবং এদেরকে স্ত্রী-সঙ্গী হিসাবে ভজন-সাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করেন—অর্থাৎ বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হন। এরা বৈষ্ণব শাস্ত্রে বর্ণিত উপবাসাদি করে না এবং ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির পূজাও এদের মধ্যে নিষিদ্ধ। তবে অনেক সময় নিজেদের মনমতো করে রাধাকৃষ্ণের গুণগানের মহড়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কিছু বাউল গায়ক রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কীয় শুক-সারির কথপোকথনের গান গেয়ে সরল লোকদেরকে মোহিত করার চেষ্টা করে এবং এভাবে নিজেদেরকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমিক বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে।

"বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের, রাই আমাদের;
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন,
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ;
নৈলে শুধুই মদন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরে ছিল।
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল;
নৈলে পারবে কেন।"—ইত্যাদি।

এই গানে রাধাকৃষ্ণের বিশুদ্ধ সম্পর্ক থাকলে কি হবে—অনাচারী বাউলেরা এর মধ্যেই প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক খুজে পায় এবং সে অনুযায়ী স্ত্রী-সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমকে জড়ীয় প্রেমের রূপ দিয়ে যৌন আস্বাদনের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

বাউলরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ভাটিয়ালী সুরে দেহ-তত্ত্ব বিষয়ক গান করে। **"স্বরূপ দামোদর কড়চা"** নামে এদের একটি কল্পিত গ্রন্থ আছে। এরা নিজেদের সুবিধামত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করে এবং নিজেদের মনমতো করে ব্যাখ্যা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মহাপ্রভু তাঁর গম্ভীরা লীলায় রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলারস আস্বাদন করার সময় বিভিন্ন ভাবের রসে উন্মাদ হয়ে অনেক সময় প্রলাপ করতেন। এক সময় তিনি তাঁর প্রিয় ভক্ত জগদানন্দ পন্ডিতকে নবদ্বীপে পাঠান শচীমাতাকে শান্তনা দেয়ার জন্য এবং এই সাথে মার উদ্দেশ্যে বলেন-

"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিলু সন্ন্যাস।
বাউল হঞা আমি কৈলু ধর্ম্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি-পুত্র সে তোমার ॥"

(চৈ. চ. অন্ত ১৯/৯-১০)।

শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু জগদানন্দ পন্ডিতের কাছ থেকে মহাপ্রভুর রাধাকৃষ্ণ প্রেমের অর্ন্তদ্দশা, বাহ্যদশা, পদ্ধবাহ্য ইত্যাদি শুনে তাঁকে সাংকেতিক পত্র পাঠান-

"বাউলকে কহিহ,-লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ,-হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিহ, কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ, -ইহা কহিয়াছে বাউল ॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ১৯/২০-২১)।

উপরোক্ত শ্লোকগুলির কল্পিত ব্যাখ্যা করে বাউলদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, শ্রী অদ্বৈত আচার্য এবং মহাপ্রভু উভয়ে মনেপ্রাণে বাউল ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এর আসল তাৎপর্য ছিল এই যে অদ্বৈত প্রভু বলেছেন, 'মহাপ্রভুকে কহিও যে, লোক সকল কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়েছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল আর বিক্রয়ের স্থান নেই। মহাপ্রভুকে বলিও যে আউল-অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল -অর্থাৎ অদ্বৈত আচার্য আর সাংসারিক কাজে লিপ্ত নেই। মহাপ্রভুকে বলিও যে প্রেমোন্মত্ত হয়েই অদ্বৈত একথা বলেছে। অর্থাৎ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভুত হওয়ার যে তাৎপর্য ছিল তাহা পরিপূর্ণ হয়েছে। এখন

প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।' অদ্বৈত প্রভুর উপরোক্ত সাংকেতিকপত্র পাওয়ার পর মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করেন এবং সেদিন থেকেই কৃষ্ণ বিরহে তার দশা দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়। তাই শ্রী অদ্বৈত প্রভু এবং মহাপ্রভু বাউল ছিলেন–বাউল মতাবলম্বীদের এরূপ দাবী হাস্যকর নয় কি?

একশ্রেণীর বাউলদের মুখে এক অন্তরে অন্য–এই রূপ দেখেই শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ তার **"হুতোম প্যাচার নকশা"** নামক বইতে এদের সম্পর্কে উপহাস করেছেন–

"বাউলেরা ললিত রাগে খরতাল ও খঞ্জনীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম ও
ঝুলিতে মালা রেখে, জপ্‌লে আর হবে কি।
কেবল কাঠের মালার ঠক্‌ঠকি, সব ফাঁকি॥
লোকের দুয়ারে গান করে বেড়াচ্চে।

....

সিম্‌লের শাম উত্তম কিত্তুর্নী–বয়স অল্প-দেখতে মন্দ নয়–গলাখানি যেন কাঁসি খন্‌খনে্‌ কচ্চে। কেত্তন-আরম্ভ হলো–কির্ত্তুনী তাথইয়া তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননী চুরি করে খাঞ্ৰীছে, আরে আরে ননী চুরি করি খাঞ্ৰীছে তাথইয়া তাথইয়া গান আরম্ভ কল্লে, সকলে মোহিত হয়ে পড়লেন। চারিদিক থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগ্‌লো, খুলিরে হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে লাগলে! কির্ত্তনী হাঁটু গেড়ে কখনো দাঁড়িয়ে মধু বিষ্টি করতে লাগ্‌লেন–

হরিপ্রেমে একজন গোঁসাইয়ের দশা লাগলো, গোড়ারা তাঁকে কোলে করে নাচতে লাগলো। আর যেখানে তিনি পড়েছিলেন, জিব দিয়ে সেইখানের ধুলো চাটতে লাগলো।"

[**শ্রী কালী প্রসন্ন রায় ঃ** হুতোম প্যাচার নকশা, পৃঃ ৬০–৬১]

উপরোক্ত উপহাস থেকে বুঝা যায় বহুকাল পূর্ব থেকেই বাউল মতবাদ সমাজে বেশ জেকে বসেছিল। বাউলরা বৈষ্ণব সাজে সজ্জিত হয়ে সঙ্গে বোষ্টমী নিয়ে খোল করতাল–খঞ্জনী সহযোগে কৃষ্ণ লীলার কিছু অংশ, শুক শারী সংবাদ ইত্যাদি গান গেয়ে লোকদেরকে মোহিত করে টু-পাইস কামিয়ে নিত। এদের মালা জপা এক ধরনের ভন্ডামী। আজও উভয় বাংলার অনেক জায়গায় এরূপ বাউলদের দেখতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ বাউল হিসাবে

পদ্মলোচন, ফটিক গোসাই, রাধেশ্যামদাস, চন্ডীগোসাই, চন্ডীদাস গোসাই, অনন্ত গোসাই প্রমুখের নাম করা যায়।

৭ নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়

মুন্ডিত মস্তককে চলিত ভাষায় নেড়া বলে। নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রবাদ হলঃ কোন এক সময় শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীল বীরচন্দ্র গোস্বামী তৎকালীন পূর্ব বঙ্গে আসেন। সেখানে ঢাকায় অবস্থানকালীন সময়ে তিনি তখনকার মুসলমান নবাবকে অনুরোধ করে ১২ শত কয়েদিকে মুক্ত করেন। তিনি এদেরকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দান করেন। পরে জাহ্নবা মাতার (শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন এবং বীরচন্দ্র প্রভুর বিমাতা) কাছে এদেরকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হন। জাহ্নবা মাতার কাছে এসব মুক্ত কয়েদীর জন্য খাদ্য প্রার্থনা করেন। জাহ্নবা মাতা ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ-শক্তি। তিনি উক্ত কয়েদীরা প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব ধর্মের উপযোগী কিনা তা পরীক্ষার জন্য নিজের শক্তি বলে ১৩ শত নেড়ী বা স্ত্রীলোক সৃষ্টি করে প্রত্যেক কয়েদীকে একজন করে নেড়ী প্রদান করতে আরম্ভ করেন। তখন ১১৯৬ জন নেড়া ঐরূপ স্ত্রীলোক গ্রহণ করেন। কেবলমাত্র ঐ দলের গোকুলানন্দ স্ত্রী-সঙ্গ ভয়ে রমানাথ প্রমুখ তিনজনের সাথে পলায়ন করেছিলেন এবং তৎকালীন ২৪ পরগণা জেলার বেলে বসিরহাটে গিয়ে বসবাস করেন।

কয়েদীগণকে কারামুক্ত করে দীক্ষাদানকালে মস্তক মুন্ডন করা হয়েছিল বলে এদেরকে নেড়া নামে অভিহিত করা হয়। সেই থেকে নেড়া-নেড়ীর দল বলে প্রবাদ চালু আছে।

নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায় নিজেদেরকে শ্রীমন্ নিত্যনন্দ প্রভুর ছেলে শ্রীল বীরচন্দ্র গোস্বামীর অনুগত এবং শাখা বলে পরিচয় দেয়। এরা মাথা মুন্ডন করে এবং শিখা ধারণ করে। এছাড়া গোপীচন্দনের তিলক ধারণ ও একাদশী ব্রত পালন করে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও নেড়ী বা স্ত্রী সঙ্গ করে। তাছাড়া এদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব সদাচার বিরুদ্ধ মৎসাদি ভোজন করে। এদের মতে পরলোকগত আত্মার জন্য মালসায় ভোগ নিবেদন করলেই ঐ আত্মা মুক্ত হয়ে যায়।

এটি এই সম্প্রদায়ে "মালসা ভোগ" বিধি নামে পরিচিত। এই বইয়ের পাঠকদের মধ্যে অনেকেই হয়তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাস

পড়েছেন। এই উপন্যাসের ২য় পর্বে শ্রীকান্ত যখন রেঙ্গুনে যাত্রা করেন তখন জাহাজে তার সাথে নন্দ-মিস্ত্রী এবং টগর বোষ্টমী নামে দুইজনের পরিচয় হয়। বোষ্টম-বোষ্টমী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তারা জাতপাত ছাড়তে পারেন নাই। তাইতো দেখি টগর বোষ্টমী শ্রীকান্তকে বলছে, এতদিন একসাথে থাকা সত্ত্বেও নীচুজাতের লোক হওয়ায় নন্দ মিস্ত্রীকে সে হেঁসেলে (রান্না ঘরে) কখনো ঢুকতে দেন নাই। আবার টগর কর্তৃক আনীত খাদ্যের একাংশ যখন জাহাজে অবস্থানকারী অন্যধর্মের একদল লোক গোপনে খেয়ে ফেলে তখন নন্দ মিস্ত্রী বাকী অংশ রেখে দেয়ার জন্য টগর বোষ্টমীকে উপদেশ দেয়। এখানে শরৎবাবু নন্দমিস্ত্রীর মুখ দিয়ে উপহাসের ছলে বলেন, "রেখে দে টগর, তোর মালসা ভোগে লাগবে।" এভাবে দেখা যায় তৎকালীন সময়ে একশ্রেণীর বোষ্টম-বোষ্টমীদের মধ্যে মালসা ভোগের প্রচলন ছিল। এরা নিজেদেরকে বৈষ্ণব বলে দাবী করলেও পূর্বসংস্কার বশত জাত-পাতের বিষয়টি বিসর্জন দিতে পারেনি। অথচ খাটী বৈষ্ণবের জাত-পাত থাকার কথা নয়।

নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার অনেককে **শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত** ও **শ্রীচৈতন্য ভাগবত** ইত্যাদি গ্রন্থপাঠে উৎসাহী দেখা যায়। কিন্তু এসব অমূল্য গ্রন্থের সঠিক তাৎপর্য তারা গ্রহণ না করে নিজেদের মন-কল্পিত অনেক সিদ্ধান্ত প্রচলন করেছে। এজন্য এদেরকে বৈষ্ণব নামধারী অপসম্প্রদায় নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৮ অতিবড়ী সম্প্রদায়

এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন শ্রী জগন্নাথ দাস নামে একজন ব্রাহ্মন। ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের পুরী জেলার কপিলেশ্বর নামক এক গ্রামে শ্রী ভগবান পান্ডার ঔরসে ও পার্বতী দেবীর গর্ভে ভাদ্র মার্সের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে তার বাবার নাম শ্রী ভগবান দাস ও মাতার নাম পদ্মাবতী। এই মতে শ্রী ভগবান দাস কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ও পুরান পাঠক ছিলেন। তিনি পুত্রকে অল্পবয়সে উপনয়ন দিয়ে সংস্কৃত শাস্ত্র ও ব্যাকরণ কাব্য অধ্যয়ন করান। জগন্নাথ দাস অতিশয় মেধাবী ছিলেন। পিতার শিক্ষায় জগন্নাথ দাস শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দিরের নিকটে বট গনেশের কাছে বসে পুরান শাস্ত্র মধুর সুরে পাঠ করতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী তাঁর গানে সহজেই আকৃষ্ট হতো। এই সময়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু পুরীতে

অবস্থান করছিলেন। একদিন জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে বন্দনাপূর্বক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। মহাপ্রভু কৃপা করে তাকে (জগন্নাথ দাসকে) ভক্তি উপদেশ দান করেন।

জগন্নাথ দাস প্রভুর কাছে মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করলেন। মহাপ্রভু তাকে শ্রী বলরাম দাস প্রভুর নিকট থেকে মন্ত্র নিতে আদেশ করেন। শ্রী গৌরীদাস পন্ডিতের শিষ্য ছিলেন শ্রীহৃদয় চৈতন্য। তাঁর শিষ্য ছিলেন শ্রীবলরাম দাস। উড়িষ্যার অধিবাসী শ্রী দিবাকর দাস শ্রীজগন্নাথ দাসের জীবনী উপরোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি জগন্নাথ দাসের জীবনীতে অনেক অলৌকিক বিষয় বর্ণনা করেছেন।

শ্রী জগন্নাথ দাস নবাক্ষর ছন্দে শ্রীমদ্ ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেন। এতে ভক্তিতত্ত্ব বিরোধী অনেক কথা থাকায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু অসন্তুষ্ট হয়ে জগন্নাথ দাসকে বলেছিলেন ঃ **"তুমি মুনি-ঋষি অপেক্ষাও বড়। কারণ–তাঁহাদের উপর কলম ধরিয়াছ।"** সেই সময় থেকে সবাই জগন্নাথকে অতিবড়ী আখ্যা দেয়। এই কারণে পরবর্তীতে জগন্নাথ দাসের শিষ্যগণ অতিবড়ী সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়।

শ্রীজগন্নাথ দাস প্রথমে গৌড়ীয় হলেও পরবর্তীতে তিনি ষড়গোস্বামীর সিদ্ধান্ত সর্বত্র স্বীকার করেননি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রীতিনীতি ও আচার-আচরণের দিক থেকেও অতিবড়ী সম্প্রদায়ের অনেক বিভেদ আছে। শ্রী জগন্নাথ দাসের লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে **ভাগবতের পদ্যানুবাদ** ছাড়াও **ষোলচৌপদী, গুন্ডিচাবিজে, সৎসঙ্গ বর্ণন, গোলক সারোদ্ধার, ব্রহ্মান্ডভূগোল, প্রেম সাধন, দূতীবোধ,** ইত্যাদি রয়েছে।

অতিবড়ী সম্প্রদায় সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার **বঙ্গে সামাজিকতা** (বর্ণ ও ধর্ম্মগত সমাজ) বইতে এরূপ মন্তব্য করেন ঃ " স্পষ্টাদায়িক সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারা আপনাদের বিধিবিধান স্থির করিয়া লইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুর্নৈতিক আচরণ কোন কোন ব্যক্তিতে দেখা যায়। ইহারা নিরাকারবাদী।"

৯. স্পষ্টদায়িক সম্প্রদায়

শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর বড় মেয়ে হেমলতাদেবী এবং পিতার শিষ্য রূপ কবিরাজের মধ্যে একসময় কিছু বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিষয়ে মতবিরোধ হয়।

হেমলতা ছিলেন ভাগবত সিদ্ধান্তে সুনিপূণা এবং তেজস্বিনী লোক-শিক্ষয়ত্রী। তাঁর পিতার শিষ্য শ্রী রূপ কবিরাজ একসময় শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের নামে সহজিয়া মতপোষক এক জাল গ্রন্থ বের করে তা প্রচারের চেষ্টা করেন। এছাড়া রূপ কবিরাজ কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজের গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যের নির্দেশিত পন্থার প্রতিও কটাক্ষ করেন। এসব ব্যাপারে হেমলতা দেবীর সাথে রূপ কবিরাজের বিরোধ এবং শাস্ত্রীয় বিতর্ক হয়। রূপ কবিরাজ হেমলতার যুক্তি ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলায় তাকে সমাজচ্যুত করা হয়। হেমলতা রূপ কবিরাজের গলার একটি মালা ব্যতীত অপরগুলো ছিড়ে দেন।

স্ত্রী-সঙ্গী এবং ভগবৎ ভক্তিহীন-এই দুই প্রকার অসৎ সংগ ত্যাগ করাই প্রকৃত বৈষ্ণবের আচার। কিন্তু শাস্ত্রীয় এই উপদেশের যথার্থ অর্থ না বুঝে রূপ কবিরাজ তার গুরুদেব শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে স্ত্রী-সঙ্গী মনে করেছিলেন। পরমহংস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আচরন বুঝার সামর্থ রূপ কবিরাজের ছিল না। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু দুইবার দার পরিগ্রহ (বিবাহ) করেছিলেন। এই দেখেই রূপ কবিরাজ জড় ইন্দ্রিয় জ্ঞানে প্রতারিত হয়ে নিজের গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে। এক সময় সে প্রচার করতে আরম্ভ করে যে যখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ হল স্ত্রী-সঙ্গীকে অসৎ বলে তার সংগ ত্যাগ করা, তখন গৃহস্থ ব্যক্তি বৈষ্ণবাচার্য্য হতে পারেন না।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর অধিকার ও যোগ্যতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা রূপ কবিরাজের ছিল না। এজন্যই মহাপ্রভুর উপদেশ কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা তিনি অনুধাবন করতে পারেন নাই।

শ্রী রূপ কবিরাজ বৈষ্ণব সমাজচ্যুত হয়ে নিজের উদ্যোগে শিষ্য সংগ্রহ করেন। তার শিষ্যরা বলেন রূপ কবিরাজ স্পষ্টবাদী ছিলেন। এ থেকে স্পষ্টবাদী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গলায় একটিমাত্র মালা পড়েন। অনেকেই বৈষ্ণব সদাচারের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন। কালে এই সম্প্রদায়ে স্ত্রী ও পুরুষের একত্র অবস্থান স্বীকৃত হয়েছে। এরা কারোও হাতে অন্ন গ্রহণ করেন না। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলে ভগবৎ কীর্ত্তন করেন। এদের অপর নাম শূর্মা।

১০. চূড়াধারী সম্প্রদায়

চূড়াধারী সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি কাহিনী হল এরূপ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দাস নামে শ্রীল অভিরাম গোস্বামীর একজন শিষ্য ছিলেন। ইনি ভারতের

মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন জঙ্গীপুরের নিকট বাজিতপুরে শ্রী শ্রী শ্যাম সর্বেশ্বর নামক এক শ্রীবিগ্রহের সেবক ছিলেন। কথিত আছে একসময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং তাঁর পুত্র শ্রীল বীরচন্দ্র গোস্বামী এবং তাদের শিষ্যগণ ময়ুরের পুচ্ছ দ্বারা মাথায় চুড়াধরা করে পড়তেন। পরে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র শ্রীগোপীজন বল্লভ প্রমুখ তাঁদের শিষ্যদেরকে ঐরূপ বেশ করতে নিষেধ করেন। উপরোক্ত রামকৃষ্ণদাসও চূড়াধারী ছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্ত বা নিষেধাজ্ঞা মানতে অস্বীকার করেন। এই কারণে তাঁকে তৎকালীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে ত্যাজ্য করা হয়। সেই থেকে তিনি চূড়াধারী নামে অভিহিত হন এবং এ থেকে চূড়াধারী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ দাস ছাড়াও এই সম্প্রদায়ের শ্রী মাধব চড়ূাধারীর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি বাসুদেব শৃগালের শিষ্য ছিলেন। এই বাসুদেব শৃগাল প্রথমে একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন। পরে অন্যায় আচরণের জন্য এই সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত হন। শ্রী শ্যামলাল গোস্বামী রচিত **"প্রেম সম্পূটম"** গ্রন্থ থেকে দেখা যায় এই বাসুদেব একজন রাঢ়দেশীয় (বর্ধমান জেলার একটি অংশ পূর্বে রাঢ়দেশ বা রাঢ়পরগণা হিসাবে পরিচিত ছিল) ব্রাহ্মণ ছিলেন। দুরাচার করে নিজেকে কখনো ঈশ্বর এবং কখনো নন্দদুলাল (শ্রীকৃষ্ণ) বলে পরিচয় দিতেন।

তার কথা শুনে তৎকালীন সময়ে লোকজন তাকে শৃগাল আখ্যা দেয়। সে থেকে তিনি বাসুদেব শৃগাল নামে অভিহিত হন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ কর্তৃক তিনি বৈষ্ণব সমাজ থেকে ত্যাজ্য এবং অগ্রাহ্য হন।

বাসুদেব শৃগালের শিষ্য হওয়ায় মাধব চূড়াধারীও বৈষ্ণব সমাজ থেকে বিতাড়িত হন। কথিত আছে এই মাধব কোন এক রাজার অলঙ্কার চুরি করে এক গোপ পল্লীতে গিয়ে সেখানে পুরোহিতগিরি করতে থাকে। সে নিজেকে কখনো কৃষ্ণ এবং কখনো বা নারায়ণ বলে প্রচার করতো। চূড়া ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ সেজে লোকজনকে বলতো যে তাকে ভজলেই বৈকুণ্ঠলোকে গতি হবে। এর ফলে চন্ডাল এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর নারীগণ তার প্রতি আসক্ত হয় এবং সেই সুযোগে সে কৃষ্ণলীলার ছলে ঐসব নারীদের সাথে সংসর্গে লিপ্ত হতো। এই চূড়াধারী মাধব একসময় নীলাচলে উপস্থিত হয়। সেখানে সে

নারীগণ সহ সংকীর্ত্তনে লিপ্ত হলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাকে পুরীধাম থেকে বহিষ্কার/বিতাড়িত করার আদেশ দিয়েছিলেন।

চূড়াধারীদের মতবাদ মূলতঃ বাউল মতের ন্যায়। এদের মতে পরকীয়া রস আস্বাদন করতে হলে পরনারী সঙ্গে রাখা দরকার। এরা সদাচারহীন এবং বৈদিক কর্মরহিত। গোপী যন্ত্রে বাউল সঙ্গীত গেয়ে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে। রাধাকৃষ্ণের পুজা ছাড়া অন্য দেবদেবীর পুজা করে না। তাঁদের মতে ঈশ্বর এক। এরা চুল ও দাড়ী রাখে, মাথার ঝুটিতে ময়ুরের পুচ্ছ ধারণ করে কৃষ্ণের মতো সাজে এবং সেবাদাসী সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। নিজেদের বৈষ্ণব বলে পরিচয় দেয়। এদের মধ্যে অনেকেই হলুদ রঙের আলখেল্লা পরে, উৎসবাদিতে মালসা ভোগ দেয়, গোপীচন্দন দ্বারা তিলক করে এবং গৌর-নিত্যানন্দের গান করে।

চূড়াধারীরা তাঁদের গুরু প্রণালী এভাবে দাবী বা প্রকাশ করে ঃ শ্রী শ্রী জাহ্নবা মাতা (নিত্যানন্দ প্রভুর স্ত্রী) শ্রীল বীরচন্দ্র গোস্বামী, (নিত্যানন্দ প্রভুর ছেলে), রামকৃষ্ণ চূড়াধারী, মাধব দাস চূড়াধারী, কৃষ্ণদাস চূড়াধারী, বালকানন্দ চূড়াধারী, রামজীবন চূড়াধারী, কৃষ্ণতারণ চূড়াধারী, নবীনকৃষ্ণ দাস চূড়াধারী এবং তিনকড়ী শর্মা চূড়াধারী ইত্যাদি। শ্রীবৃন্দাবনে চূড়াধারীদের কুঞ্জ আছে। তবে তারা বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন।

১১. সখীভেকি সম্প্রদায়

যারা কৃত্রিমভাবে পুরুষ শরীরকে নারীবেশে সজ্জিত করে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার অভিনয় করে তাদেরকে সখী-ভেকী সম্প্রদায় বলে। ভেকী শব্দে বেশ বুঝায়। তাই সখী-ভেকী বলতে সখীর মতো বেশধারণ করা বুঝায়।

নবদ্বীপ ধামে ললিত-সখী-নামক একজন ব্যক্তির দ্বারা এই মত প্রথম প্রচারিত হয়। তিনি ব্রাহ্মণকুলের জনৈক সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই মতের অন্যতম সমর্থক ছিলেন শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজ। নবদ্বীপে এই মত প্রচলিত হওয়ার পর অনেক বাবাজী এর ধারক এবং বাহক হয়ে পড়েন। এমনকি পুরী এবং শ্রী বৃন্দাবনেও এই মত অনেকটা ছড়িয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পুরীতে এক সময় শ্রীচরণদাস নামে এক বাবাজী বিভিন্ন স্থানে কীর্ত্তন করে বেড়াতেন। তিনি মাঝে মাঝে বৈষ্ণব চূড়ামনি শ্রীল ভক্তি

বিনোদ ঠাকুরের কাছে আসতেন। এই চরণদাস বাবাজী নিজে একটি কীর্ত্তন পদ রচনা করে গান করতে করতে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতেন। উক্ত ছড়াগান অপেক্ষা "হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র" কীর্ত্তন শ্রেয়ঃ—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁকে এই উপদেশ দেয়া সত্ত্বেও তিনি তা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি পুরীধামে সখী-ভেকি মত প্রবর্তন করেছিলেন।

সখী-ভেকি মতের অনুসারীরা যুক্তি দেন যে গোপী সেজে কৃষ্ণের সাধন-ভজন করলে অধিক সুখ লাভ করা সম্ভব। কারণ গোপীরা নিজেদের সুখ-দুঃখের বিচার করেন না। কৃষ্ণের সুখের জন্য তারা সব ধরনের কাজ করতে কোনভাবেই কুণ্ঠিত নন।

"আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার ॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।"

(চৈ. চ. আদি ৪/১৭৪-১৭৫)।

কাজেই গোপীভাবে—অর্থাৎ সখীভাবে কৃষ্ণের ভজনা করলেই শ্রীকৃষ্ণের উত্তম সেবা হবে। তাই নিজেকে উত্তমরূপে সজ্জিত করতে হবে যাতে তাকে স্পর্শ করে কৃষ্ণ সন্তোষ লাভ করেন। এজন্য সখী-ভেকী মতের সমর্থকরা যুক্তি দেন যে নিজের দেহ আত্মতৃপ্তির জন্য সাজানো উচিত নয়। কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্যই তা করা উচিত।

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহোত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈঁলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ কারণ ॥
এই দেহ-দর্শন—স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ।"

(চৈ. চ. আদি ৪/ ১৮১–১৮৩)।

"লঘুভাগবতামৃতে" আছে (২/৪০) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সম্বোধন করে বলেছেন—

"নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মামতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেমভাজনম্॥"

–অর্থাৎ যে সব গোপী তাঁদের নিজ শরীর আমার ভোগ্য বলে তাতে যত্ন প্রকাশ (নিজের দেহকে উত্তমরূপে সজ্জিত) করে হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেউ নেই।

সখী-ভেকি মতের অনুসারীরা উপরোক্ত শ্লোকগুলির উপর অতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, এই দেহ-মন সবই কৃষ্ণ সেবার জন্যই। তাই একে বিভিন্নভাবে উত্তমরূপে সজ্জিত করে কৃষ্ণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। নিজের সুখের জন্য নয় কৃষ্ণের সুখের জন্য। তাই গোপীর ভাব অনুকরন করে এই জড় দেহ দ্বারাই কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করা সম্ভব।

কিন্তু আসলে কি তা সম্ভব? গোপীগণ ছিলেন নিত্যসিদ্ধা। গোপীগণ শুধু মনে মনে ভাবেন তাদের দর্শন পেলেই কৃষ্ণ সুখ পান। এই সুখেই গোপীর সুখ। নিজেরা সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের সাথে সম্ভোগ রসে কখনো লালায়িত হন না।

"আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥
গোপীগণ যবে করেন কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটীগুণ ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়
তাহা হৈতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয় ॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ সুখ-পোষে।
এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম-দোষ ॥"

(চৈ. চ. আদি ৪/১৮৫–১৮৭; ১৯৫)।

এই হল এককথায় নির্গুন ভক্তিযোগের লক্ষণ। অপ্রাকৃত সেবা ছাড়া গোপীদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নেই। গোপী প্রেম হল স্বাভাবিক, কাম গন্ধহীন। এই প্রেম হল নির্ম্মল ও শুদ্ধ। এই গোপীরাই কৃষ্ণের প্রিয়া শিষ্যা, সখী এবং দাসী এবং এক এক সময় এক এক ভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হন।

"কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা, সখী, দাসী ॥
গোপিকা জানেন, কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি, ইষ্টসমীহিত ॥

(চৈ. চ. আদি ৪ / ২১০–২১১)।

আবার গোপীবৃন্দের মধ্যে উত্তমা হলেন শ্রীমতি রাধিকা। তিনি রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং সর্বোপরি কৃষ্ণপ্রেমে সবার উপরে ছিলেন। শ্রীমতি রাধিকার সাথে ব্রজেন্দ্র নন্দনের যে সম্পর্ক সেক্ষেত্রে গোপীগণ বা সখীগণ ছিলেন সহায়িকা। রাধাকৃষ্ণের সর্বপ্রকার সুখের জন্য গোপিকারা সর্বতোভাবে সহায়তা করেন। তাঁদের সুখেই গোপীরা প্রকৃত সুখ অনুভব করতেন।

"রাধাসহ ক্রীড়া রস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ - প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥"

(চৈ. চ. আদি ৪/ ২১৭–২১৮)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় গোপীরা নিজের দৈহিক সুখের জন্য কৃষ্ণের সঙ্গ কামনা করতেন না। তারা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন নিষ্কাম। এজন্যই দেখা যায় রাধাকৃষ্ণের লীলার সময় প্রধান অষ্টসখী অষ্টভাবে ভাবিত শ্রীমতি রাধিকাকে কৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের জন্য যখন যা প্রয়োজন তার যোগান দিতেন। প্রয়োজনে রাধার মান ভাঙ্গাতেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরূপ অনুশাসন করতেন।

সখীভাবে কৃষ্ণের ভজনা করা রাগাত্মিকা ভক্তির মধ্যে পড়ে। আর সখীর দাসী হয়ে কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হওয়াকে বলে রাগানুগ ভক্তি। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই শেষোক্ত ভক্তির উপর গুরুত্ব দেন মাত্র। কারণ জড়দেহে সাধারণ লোকের পক্ষে কোন ক্রমেই রাগাত্মিকা ভক্তি-ক্রমে সাধন ভজন করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র ব্রজবাসিগণের পক্ষেই তা সম্ভব ছিল।

"রাগাত্মিকা ভক্তি–মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তি রাগানুগা–নামে।"

রাগানুগা ভক্তির মূল কথা হল মঞ্জরীভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। অর্থাৎ কোন সখীর অনুগত বা দাসী হয়ে সেবা করাই বিহীত কাজ।

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিক ও পরমভাবে বা একান্তভাবে আবিষ্ট হয়ে সেবার যে মনোবৃত্তি তাকেই বলে রাগ। কৃষ্ণভক্তি সেইরূপ রাগময়ী হলে তাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীগণের মধ্যে অভিব্যক্তরূপে রাগাত্মিকা ভক্তি

বিরাজমান ছিল। এই ভক্তির অনুসৃতা বা অনুগতা যে ভক্তি তাই হল রাগানুগ ভক্তি। ব্রজবাসীগণের ভাব এবং মাধুর্য শ্রবণ করে তাদেরকে অনুসরণ করে (অনুকরণ করে নয়) রাধকৃষ্ণের সেবাই হল রাগানুগ ভক্তি। শাস্ত্র বা কোন প্রকার যুক্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই সরাসরি রাগাত্মিকা ভক্তি নয়' বরং রাগানুগ ভক্তিই জড় দেহধারী জীবের কৃষ্ণ সেবার অনুকূল হতে পারে মাত্র।

"ইষ্টে গাঢ়-তৃষ্ণা-রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা-তটস্থ-লক্ষণ কথন ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা-নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥"

এই রাগানুগা ভক্তি বাহ্য এবং অভ্যন্তর–এই দুইভাবে সাধন করা যায়। বাহ্যভাবে সাধক ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করবেন। আর নিজের দেহকে সিদ্ধ করে সর্বদা মনে মনে ব্রজে বাস করত কৃষ্ণের সেবা করবেন। এইভাবে রাগানুগাভক্তির মাধ্যমেই কৃষ্ণের চরণে প্রীতি হতে পারে।

অথচ সখী ভাবের অনুসারীরা নিজেরাই সখীভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের সেবা করতে চান। কিন্তু বাস্তবে জড়দেহে এরূপ সাধন-ভজন কি সম্ভব? তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোকে এদেরকে বৈষ্ণব নামধারী অপসম্প্রদায় বলা যায়।

১২. জাত গোস্বামী/গোঁসাই সম্প্রদায়

গোস্বামী শব্দটিকে যারা একটি নিছক উপাধি বলে মনে করেন তাদেরকে জাত গোস্বামী বা গোঁসাইবাদী বলা যায়। গো শব্দের এক অর্থ হল ইন্দ্রিয়। স্বামী শব্দের অর্থ হল প্রভু বা নিয়ন্ত্রক। তাই গোস্বামী পদবাচ্যে তারাই ভূষিত হতে পারেন জড়-ইন্দ্রিয় সকলের উপর যাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের উপর নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণই গোস্বামী পদবী ধারনের উপযুক্ত। নিছক বংশ পরম্পরায় গোস্বামী উপাধি ধারণ করা শাস্ত্রসম্মত নয় বলা যায়।

জাত গোস্বামী বা গোঁসাইরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মূলতঃ মন্ত্র ব্যবসায়ী হন। নিজেদের গোস্বামী-বংশীয় বলে পরিচয় দেন। নিজেরা বংশ ধারায় গুরু

পরম্পরা বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। এরা কিছু কিছু বৈষ্ণব সদাচার নিজেদের সুবিধামত পালন করেন এবং শিষ্যদেরকেও পালনের উপদেশ দেন। পাত্র-পাত্রী বিচার না করে নির্বিচারে মন্ত্র দীক্ষা দিয়ে শিষ্য করেন। অনেক সময় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ এবং কীর্ত্তন করে অর্থ উপার্জন করেন। এদের মধ্যে অনেকে বাহ্যত বৈষ্ণব বেশ ধারণ করলেও মনে-প্রাণে স্মার্ত্তবাদী হয়।*

তথাকথিত গোসাই/গোস্বামীদের মধ্যে একদল আছেন যারা নিজেদেরকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলে দাবী করেন। তারা বলেন গুরুই স্বয়ং কৃষ্ণ। এরা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ থেকে পাঠ করে শিষ্যদের মাঝে এরূপ বদ্ধমূল ধারণা ঢুকিয়ে দেন যে যেনতেনভাবে গুরু হলেও তিনি কৃষ্ণ। অর্থাৎ গুরুমাত্রেই কৃষ্ণ। তাই তিনি কোন ধর্মীয় নিয়ম বা নিষ্ঠাচারের অধীন নন। যে কোন শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের উর্ধ্বে। কারণ–

১. **গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।**
গুরুদেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ॥

২. **যদ্যপি আমার গুরু–চৈতন্যের দাস।**
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমানে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

(চৈ. চ. আদি ১/৪৪-৪৫)

৩. **শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।**
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ–এই দুই রূপ ॥

(চৈ. চ. আদি ১/৪৭)।

৪. **আচার্য্যং মাং বিজানীয়ন্নোবমন্যেত কর্হিচিৎ।**
ন মর্ত্ত্যাবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময় গুরু ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/১৭/২৭)।

– অর্থাৎ ভগবান উদ্ভবকে বললেন, "হে উদ্ধব! গুরুদেবকে আমার

---

* এই বইতে প্রকৃত গোস্বামীদেরকে নিন্দাবাদ করা হয় নাই একথা পাঠকদেরকে স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু গোস্বামী পদবী ধারণ করে বৈষ্ণব ধর্মের বিরুদ্ধ বিভিন্ন অনাচারে যারা লিপ্ত তাদের ব্যাপারেই এক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বরূপ জানিরে। গুরুতে সামান্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। **গুরু** সর্বদেবময়।"

উপরোক্ত সব শ্লোকের অর্থ সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য যদি সদ্‌গুরু হন। তাহলে সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি? শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর **উপদেশামৃত** গ্রন্থে বলেছেন–

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থাবেগম ॥
এতাৎ বেগান্ যো বিষবেত ধীরঃ
সর্ব্বাম পীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥"

(উপদেশামৃত ১ম শ্লোক)।

– অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের (লিঙ্গ) বেগ-এই ছয়টি যে ব্যক্তি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করতে পারেন–অর্থাৎ তিনিই ষড়ুবেগজয়ী গোস্বামী।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মন্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

(শ্রীমদ্ ভাগবত ১১/৩/২১)।

– অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হওয়ার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করবেন। যিনি শব্দব্রহ্মে–অর্থাৎ শ্রুতি শাস্ত্রাদি সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত-অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি (ভগবৎ অনুভূতি) লাভ করেছেন এবং তার জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নন, তিনিই সদ্‌গুরু।

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ॥
সর্ব্বসংশয় সংছেত্তাহনলসো গুরুরাহৃতঃ ॥"

(শ্রীহরিভক্তি বিলাস ১/৩৫ শ্লোকধৃত বিষ্ণু স্মৃতি-বচন)।

– অর্থাৎ অপার কৃপাময় (অর্থাৎ যিনি স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলে যাঁর কোন অভাব নেই), সর্বগুণে গুণান্বিত, সর্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্বপ্রকার সিদ্ধ, সর্ববিদ্যা-অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তি সিদ্ধান্তে নিপুণ

এবং শিষ্যের সবধরনের সংশয় নিরসনে সমর্থ এবং অনলস–অর্থাৎ সবসময় হরি সেবানিষ্ঠ-এরূপ পুরুষই গুরু বলে কথিত হন।

কিন্তু জাত গোসাই বা জাত-গোস্বামী পদবীধারী ব্যক্তিগণ গুরু মাহাত্ম্য খুব করে বর্ণনা করলেও নিজেদের গুণাগুন কিরূপ হওয়া উচিত তা কিন্তু কখনো শিষ্য-শিষ্যা বা অপর কারো কাছে প্রকাশ বা বর্ণনা করেন না। তাহলে যে গুরুগিরি টিকবে না।

নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু গুরু পদবীধারী আবার প্রচার করেন কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের লোকেরাই–বিশেষত ব্রাহ্মণ এবং গোস্বামী পদবীধারী ব্যক্তিরাই গুরু হতে পারেন। এর সপক্ষে কেউ কেউ **মনুসংহিতার** নিম্নোক্ত শ্লোকের উদ্ধৃতি দেন–

"উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদ মধ্যাপয়ে দ্বিজঃ।
সঙ্কল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥"

(মনুসংহিতা ২/১৪০)।

–অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন প্রদান করে যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষদের সাথে সমগ্রবেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করান মুনিগণ তাঁকে আচার্য্য নামে অভিহিত করেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত যে বর্ণের এবং যে উপাধিধারীই হন না কেন–তিনিই সদ্‌গুরু হওয়ার যোগ্য।

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শুদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয় ॥"

(চৈ. চ. মধ্য ৮/১২৭)।

শ্রীগুরু প্রাকৃত জাতিকূলের অন্তর্গত মর্ত্ত্যজীব নন –

ষট্‌কর্মানিপুনো বিপ্র মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুণ স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

(শ্রীহরি ভক্তি বিলাসধৃত পাদ্মবচন)।

– অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপণ, দান, ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্মে নিপুণ এবং মন্ত্রতন্ত্র বিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও গুরু হইতে পারেন না। কিন্তু চন্ডালকুলে জন্ম নিয়েও বিষ্ণু পরায়ণ বৈষ্ণব গুরু হওয়ার যোগ্য।

"বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশাশ্চ গুরুবঃ শূদ্রজন্মানাম্।
শুদ্রাশ্চ গুরুবস্তেষাং ত্রয়ানাং ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥" (পদ্মপুরাণ)

– অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন–ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু ভগবৎ প্রিয়–অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকূলে অবতীর্ণ হলেও উক্ত তিনবর্ণের –অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কূলে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের গুরু হতে পারেন।

বিভিন্ন শাস্ত্রের উপরোক্ত শ্লোকগুলি থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে একমাত্র বিষ্ণুর অনুগত–অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত লোকই সদ্‌গুরু হওয়ার যোগ্য। তাই একশ্রেণীর গোঁসাই পদবীধারী লোকেরা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পদবীধারী ব্যক্তিই গুরু হতে পারেন বলে যে প্রচার করেন–তা অসার এবং শাস্ত্রবিরোধী বলা যায়।

গোস্বামী/গোঁসাই পদবী ধারণকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেককেই দেখা যায় নিজেরা যা আচরণ করেন তা প্রচার করেন না। আবার যা প্রচার করেন নিজেরা ব্যক্তি জীবনে তা পালন বা আচরন করেন না। অর্থাৎ নিজের সুবিধা অনুযায়ী ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। আবার নিজেই তা পালন করেন না। অথচ সদ্‌গুরুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল **"আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখায়"**। নিজে না করলে ধর্ম অপরকে শিখানো যায় না। **বায়ু পুরাণে** আছে–

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থপিয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচ্যর্য্য স্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥

– অর্থাৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে সংগ্রহ করে অপরকে আচরণে স্থাপন এবং নিজে শাস্ত্রের আদেশ আচরণ করেন বলে আচারবান তত্ত্ববিৎ পুরুষ আচার্য্য নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন–

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎ প্রমানং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

–অর্থাৎ যারা শ্রেষ্ঠ লোক তারা যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাদের অনুকরণ করেন। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্ত্তী হয় ॥

ভগবানের উপরোক্ত শ্লোকের আলোকে বলা যায় মনে প্রাণে স্মার্ত্ত দর্শনে বিশ্বাসী অথচ গোস্বামী বা গোঁসাই পদবীধারী কিছু ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্মের বিরুদ্ধ আচার-আচরণ করে তদীয় শিষ্য-শিষ্যাগণকেও সেরূপ আচারে নিষ্ঠ করছেন। এতে বৈষ্ণব ধর্মেরই সমূহ ক্ষতি হচ্ছে বলা যায়। এজন্যই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে গুরু পদবীধারীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে–

"আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
আচার, প্রচার-নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি-সর্ব-গুরু, তুমি জগতের আর্য্য ॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ৪/১০২-১০৩)।

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। এই কথা ভুলে গেলেই সে মায়ার কবলে পড়ে অধঃপতিত হয়।

"আমি নিত্য কৃষ্ণদাস–এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হয়ে চিরদিন বুলে ॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শুদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র ॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু ॥

(প্রেম বিবর্ত্ত)।

বৈষ্ণব ধর্ম অনুযায়ী কৃষ্ণকে আশ্রয় না করে অন্য কিছুর আশ্রয় নিলে মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে জীব সংসারের চক্রে কেবল ঘুরপাক খেতে থাকবে। এজন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে–

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দন্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ "

(চৈ. চ. মধ্য ২০/১১৭–১১৮)।

এইজন্য ভাগ্যবান জীব যদি সদ্‌গুরুর সন্ধান পান এবং আশ্রয় নিতে পারেন তবে গুরু এবং কৃষ্ণের কৃপায় ভক্তি মার্গে অগ্রসর হতে পারেন। তিনি

মায়ার কবল থেকে মুক্ত হয়ে একসময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভে সক্ষম হতে পারেন।

"ব্রহ্মান্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ -প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥"

(চৈ. চ. মধ্য ১৯/১৫১ এবং ২২/২৫)।

সুতরাং দেখা গেল কেবলমাত্র সদ্ গুরুর কৃপার অধীনে থেকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করতে হবে। অর্থাৎ সদ্ গুরুর কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। আবার শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়ও সদ্-গুরুর কৃপা লাভ হতে পারে।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামি রূপে শিখায় আপনে ॥"

(চৈ. চ. মধ্য ২২/৪৭)।

এখন বুঝা গেল প্রকৃত গুরুদেব শিষ্যকে কৃষ্ণের কৃপা লাভের সঠিক পথ দেখাবেন। তিনি শিষ্যের সব ধরনের সন্তাপ নাশ করেন। অথচ বাস্তবে আমরা দেখি গুরুনামধারী কিছু ব্যক্তি আছেন যারা শিষ্যের কিভাবে পারমার্থিক মঙ্গল হবে সেদিকে গুরুত্ব না দিয়ে তার অর্থ-বিত্তের উপর গুরুত্ব দেন। অনেক গুরুপদবীধারী ব্যক্তিই শিষ্য-শিষ্যার নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যা পছন্দ করেন এবং নিজের যশোলাভের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। এরা সদ্গুরু নন এবং গুরুপদবাচ্য হতে পারেন না শাস্ত্র অনুযায়ী।

"গুরুবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুল্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥"

(গৌড়ীয় কণ্ঠহারে ধৃত পুরাণ বাক্য, পৃঃ ১৪) ॥

– অর্থাৎ শিষ্যের বিত্ত বা ধন অপহরণের জন্য বহু গুরু আছেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপনাশক সদ্ গুরু দুর্লভ।

"পরিচর্য্যা–যশোলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্নহি ॥"

(গৌড়ীয় কণ্ঠহারে ধৃত বিষ্ণু স্মৃতি বচন পৃঃ ১৪)

সৎ গুরুত্যাগ শাস্ত্রীয়মতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ গুরু হলেন সর্বদেবময়। এজন্য বলা যায় যাদের মধ্যে শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি বর্তমান–অর্থাৎ যারা শ্রীগুরুদেবকে সাধারণ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করবেন তাদের সর্বকাজই বৃথা হবে এবং তারা নিশ্চিতভাবে নরকে গমন করবেন।

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥"

(শ্রী মদ্ভাগবত ৭/১৫/২৬)।

– অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুতে যার অসতী মর্ত্ত্য-সাধারণ বুদ্ধি, তার পক্ষে ভগবৎ মন্ত্রাদি গ্রহণ-মনন সবই হাতির স্নানের ন্যায় বৃথা। (কারণ হাতিরা গায়ের ধুলাবালি মোচনের জন্য স্নান করে। আবার স্নান সেরেই ধুলাবালি শুড় দিয়ে শরীরে ছড়িয়ে দেয়)।

সব শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব সাক্ষাৎ হরি বলিয়া কথিত এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। গুরুদেব হলেন জনার্দ্দন (শ্রীকৃষ্ণ) তুল্য। তিনি শিষ্যের অগতির গতি। তাই একবার গুরুবলে স্বীকার করে তাঁকে পরিত্যাগ করলে শিষ্য হবে নরাধম। কোটী কল্পকাল সে নরকে বসবাস করে। এইসব বক্তব্য সবই সত্য, তবে সদ্‌গুরু–অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুর বেলায় প্রযোজ্য, গুরুনামধারী অনাচারী ও বিষ্ণু বিদ্বেষীদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। শ্রীমদ্ ভাগবতের ৫/৫/১৮ নং শ্লোক থেকে জানা যায় ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি মৃত্যুরূপ সংসার হতে শিষ্যদেরকে মোচন করতে না পারেন সেই গুরুপদবীধারী ব্যক্তি প্রকৃত গুরু নন।

শ্রী হরিভক্তি বিলাস–এ বলা হয়েছে কুলীন এবং বেদ অধ্যায়ে পটু হলেও অবৈষ্ণব ব্যক্তি যথার্থ গুরু নন।

"মহাকুল প্রসূতোহপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখ্যাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

(শ্রী হরি ভক্তি বিলাস ১/৪০)।

– অর্থাৎ মহাকুলে জাত সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্র শাখায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হলে গুরুপদে অভিষিক্ত হতে পারেন না। তাই ভোগ বিষয়ে লিপ্ত, প্রকৃত কর্ত্তব্য-রহিত, মূঢ় এবং শুদ্ধ ভক্তি নেই ইতরপন্থানুগামী ব্যক্তি নামেমাত্র গুরু হলেও তাঁকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

(মহাভারত উদ্যোগ পর্ব ১৭৯/২৫)।

শ্রীহরিভক্তি বিলাসে বলা হয়েছে অবৈষ্ণব থেকে মন্ত্র গ্রহণ করলে নরকে যেতে হবে। এজন্য অবৈষ্ণব থেকে পূর্বে ভুলবশত মন্ত্র গ্রহণ করে ফেললেও পরবর্তীতে বৈষ্ণব গুরুর কাছ থেকে পুনরায় মন্ত্র নিয়ে নিতে হবে।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেন নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ গ্রাহ্য়েদ বৈষ্ণযাদ্ গুরোঃ।"

(শ্রীহরি ভক্তিবিলাস-ধৃত নারদ পঞ্চরাত্রে)।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় গোঁসাই নামধারী (প্রকৃত গুরু গোঁসাই/গোস্বামীদের কথা আলাদা) কিছু ব্যক্তি আছেন যারা স্নেহবশত বা লোভবশতঃ নির্বিচারে–অর্থাৎ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে যাকে তাকে দীক্ষা প্রদান করেন। আবার ভালবাসার খাতিরে অথবা কোনরূপ লাভের আশায় অনেকে কোন বিশেষ ব্যক্তির কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দুই শ্রেণীর লোক দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদ্ দীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তদ্দেবতাশাপ আপতেৎ॥"

(শ্রী হরি ভক্তি বিলাস ১/৫)।

শাস্ত্রে আছে যিনি আচার্যবেশে অন্যায়–অর্থাৎ সাত্ত্বত শাস্ত্র (বৈষ্ণব শাস্ত্র) বিরোধী কথা বলেন বা কীর্ত্তন করেন এবং শিষ্যরূপে যিনি অন্যায়ভাবে তা শ্রবণ করেন তারা উভয়ই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন **(শ্রী হরি ভক্তিবিলাস ১/৬২)**। গুরু বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হলে তাঁকে পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছণীয়। কারণ এরূপ গুরুর অবর্তমানে কোন মহাভাগবতের নিত্য সেবা করাই পরম শ্রেয়। **(ভক্তি সর্ন্দভঃ ২৩৮ সংখ্যা)**। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুব্রুব পরিত্যাগ করে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় নেয়ার কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে **(ভক্তি সন্দর্ভ ঃ ২১০ সংখ্যা)**।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে গোঁসাই/গোস্বামী পদবীধারী অথচ বৈষ্ণব সদাচার অনুসরণ করেন না এবং বিষ্ণু-বির্দ্বেষী ব্যক্তিগণ যখন সরলমতি শিষ্য-শিষ্যাদেরকে বলেন যে গুরুর কোন কাজেই প্রশ্ন করা চলে না

এবং গুরু কোন অবস্থায়ই ত্যাগ করা যায় না–তখন বুঝতে হবে এসব ব্যক্তি যথার্থ অর্থে গুরু নয়। এদেরকে যত শীঘ্র সম্ভব ত্যাগ করে সদ্‌গুরুর আশ্রয় নেয়া উচিত। কারণ স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণে অভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করলে তাকে নরকে গমন করতে হয়। এজন্য বিধি অনুযায়ী পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত।

গোঁসাই পদবীধারী (প্রকৃত গোঁসাই বা গোস্বামীদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা রেখেই বলা হচ্ছে) কিছু ভন্ড ব্যক্তি আছেন যারা শিষ্যবাড়ী যেয়েই চব্য, চোষ্য, লেহ–ইত্যাদি ধরনের খাদ্যাখাদ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে ভালবাসেন। এরা জিহ্বা বা রসনার বেগ এতটুকু দমন করতে পারেন নাই। শিষ্যরা অর্থ থাক বা না থাক ধার করে হলেও গুরুর মন রক্ষা করেন। আর দিনের পর দিন গুরু পদবীধারী এসব ব্যক্তি তোফা আরামে ভাল খেয়ে-দেয়ে নিজের দেহের পুষ্টি সাধনের দিকেই নজর দিতে ভালবাসেন। শিষ্যদের পারমার্থিক উন্নতি হল কি না সে বিষয়ে তেমন খোজখবর রাখবার আবশ্যকও বোধ করেন না। (স্মরন রাখতে হবে যারা বিষ্ণু অনুগত গোঁসাই/গোস্বামী তারা সাধারণতঃ স্বল্পাহারী হন। কারণ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা এসব গোস্বামী কৃষ্ণের কৃপায় দিব্যদেহের অধিকারী হন। তাদেরকে ভাল ভাল জড়বস্তুর প্রতিনিয়ত আস্বাদন করতে হয় না। কৃচ্ছতা সাধনই এদের অন্যতম লক্ষ্য থাকে)। এইসব ভোগী তথাকথিত গোঁসাইদের কার্যকলাপ দেখেই বহুদিন পূর্বে শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় তাঁর হুতোম প্যাঁচার নকশা গ্রন্থে এদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধরনের ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন ঃ

"হিন্দুধর্মের বাপের পূণ্যে ফাঁকি দেখাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাই গিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনো একটা রোগাদুর্বল গোঁসাই দেখতে পাইনি! গোঁসাই বললেই একটি বিকটাকার ধুম্রলোচন হবে, ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার, গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোস্ট আয়েস ও আহার-বিহার চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওঠবার যো নাই!" [শ্রী কালিপ্রসন্ন সিংহঃ হুতোম প্যাঁচার নকশা, পৃঃ ৬১]

তথাকথিত অনেক গোঁসাই আবার স্ত্রীসঙ্গ ভালবাসেন। শিষ্যাদের-বিশেষত কিশোরী এবং যুবতিদেরকে দিয়ে গা-হাত-পা টিপানো তাদের

কাছে এক ধরনের গুরু সেবা বৈকি! কারণ শাস্ত্রে আছে শিষ্য দুইভাবে গুরুর সেবা করতে পারেন ঃ বপু (দেহ) সেবা এবং বানী সেবা (অর্থাৎ গুরুর পারমার্থিক উপদেশ নিজে আচরনের পাশাপাশি অপরের মাঝেও প্রচার করা)। এই তথাকথিত গোঁসাইরা আবার যথার্থ শাস্ত্রীয় জ্ঞানে লবডংকা। তাই শাস্ত্রীয় বানী প্রচারে তাদের উৎসাহ নেই। অবশ্য যথার্থ ক্ষমতাও নেই। তাই বপু সেবাকেই তারা শিষ্য-শিষ্যা কর্তৃক গুরু সেবা বলে মনে করেন এবং তা অতি উৎসাহ এবং গুরুত্বের সাথে প্রচার করেন (আমরা গুরুর বপুসেবার বিরোধী নই। কিন্তু তথাকথিত গুরু কর্তৃক বপু সেবার নামে শুধুমাত্র সুন্দরী শিষ্যার বপুসেবার বিরোধী)। তাতে এদের অসৎ উদ্দেশ্য অনেকক্ষেত্রেই হাসিল হয়। এই সেবার নামে এরা সুযোগ পেলেই শিষ্যার সাথে যৌনাচারেও লিপ্ত হয়। এই স্ত্রী-সঙ্গী গোঁসাইরা প্রকৃতপক্ষে অসাধু এবং কৃষ্ণের অভক্ত। এদের সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে–

"অসৎসঙ্গত্যাগ,–এই বৈষ্ণব আচার
স্ত্রী সঙ্গী–এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"

(চৈ. চ. মধ্য ২২/৮৪)।

আর একদল তথাকথিত গোঁসাই আছেন যারা নিজেদেরকে কৃষ্ণরূপে আখ্যা দেন। শিষ্যাদেরকে বলেন তারা হল রাধা, আর গুরু হলেন কৃষ্ণ। তাই রাধাকৃষ্ণের মিলন মানেই গুরু-শিষ্যার মিলন। **"তুমি রাধা আমি শ্যাম"** –এই আপ্তবাক্য বলেন আর সুযোগ পেলেই প্রচার করেন। এসব গুরু নামের অপদার্থরা শিষ্যাদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র হরণ, রাসলীলা, রাধার মানভঞ্জন, ব্রজ বিহার, ইত্যাদি ধরনের লীলার জড়রূপ দিতে সচেষ্ট হন। অনেকক্ষেত্রেই তারা এব্যাপারে সফলও হন। এরা শ্রীভগবানের কালীয় দমন, পুতনা বধ, গোবর্ধন ধারণ ইত্যাদি লীলার কথা বলতে আগ্রহী হন না। হরিনামের কথা পারতপক্ষে বলেন না। এদেরকে উপহাস করেই শ্রীকালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয় লিখেছেন ঃ

"গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালীয় দমন, পুতনাবধ, গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া মানভঞ্জন, ব্রজবিহার, প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলাগুলি করে থাকেন।" আর বলেন–

"যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন্।
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ ॥
প্রেমারাধ্যা রাধাসমা তুমি লো যুবতী।
রাখলো গুরুর মান যা হয় যুকতি ॥"

এক সময় উভয় বাংলায় বৈষ্ণবতন্ত্রে গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ নতুন বিবাহ হলে গুরু সেবা না করে কন্যার স্বামী সহবাসের অনুমতি ছিল না। **হুতোম প্যাঁচার নকশা** বই থেকে দেখা যায় একবার পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে এরূপ গুরুপ্রসাদী করতে যেয়ে এক গুরুদেব বড় জব্দ হয়েছিলেন। মেদিনীপুরের বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্তী নামে একজন ধনী গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর পুত্র সন্তান ছিল না। একমাত্র মেয়েকে শহরের ব্রকভানু চাটুয্যের মেজো ছেলে হরহরি চাটুজ্যের সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের সময় কনের বয়স ১০/১১ বছর ছিল মাত্র। তাই ঐ বয়সে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানো হয় নাই। বর হরহরি চাটুয্যে কলেজে পড়তেন। এক সময় পড়াশুনা শেষ হয়। মেয়ের বয়সও তখন ১৫/১৬ তে গিয়ে পৌঁছে। এবার শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর পালা। জামাই হরহরি চাটুয্যেকে রামেশ্বর চক্রবর্তী বাড়ীতে আনালেন। কিন্তু তার পূর্বে মেয়েকে যে গুরুপ্রসাদী করতে হবে। ভাল দিন দেখে কুলগুরুকে খবর দেয়া হলে তিনি শিষ্যসামন্ত সহ এসে উপস্থিত হলেন। হরহরি বাবু যখন গুরুপ্রসাদীর কথা জানতে পারলেন তখন এর প্রতিকার করার উপায় বার করলেন। তিনি একটি লাঠি নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে থাকেন। তিনি দেখলেন স্ত্রী নানা অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে শোবার ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাড়িয়ে কাঁদতে থাকে। প্রভু খাট থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিলেন। কন্যাটি আর কি করে! বংশপরম্পরানুগত ধর্মের অন্যথা করা মহাপাপ এটি মনে গেথে রয়েছে। সুতরাং আর আপত্তি করলে না–সুড় সুড় করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো। প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, বল, আমি রাধা তুমি শ্যাম; কন্যাটিও অনুমতি মত **"আমি রাধা তুমি শ্যাম"** তিনবার বলেছে, এমন সময় হরহরি বাবু আর থাকতে পারলেন না; খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে এই **'কাদে বাড়ি বলরাম'** বলে গোস্বামীকে রুলসই করতে লাগলেন। মার খেয়ে গোস্বামীর দাঁতে কপাটী লেগে যায়, তিনি অজ্ঞান হয়ে

পড়েন। সেই থেকে মেদনীপুর অঞ্চলে গুরুপ্রসাদী প্রথা উঠে যায়। লোকেরও চৈতন্য হয়। আর প্রভুরাও ভয় পেলেন। বর্তমানে যে যে গ্রামে গুরুপ্রসাদী চলিত আছে, প্রভুরা আর স্বয়ং যান না, অনুমতিতেই কাজ নির্বাহ হয়।

বাংলাদেশেও কি গুরুপ্রসাদী প্রথা রয়েছে? এই বিষয়ে আমার কাছে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তবে কিছু কিছু গুরুপদবী নামধারী লোক যে স্ত্রী-সঙ্গী নিয়ে রাত্রিতে আমোদ-প্রমোদে গোপনে লিপ্ত হয় সে সম্পর্কে অনেক কথাই কিছু লোকের মুখে শুনি।

একসময় মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের দুইজন মহারাজ এর সাথে আমি এই প্রসঙ্গ তুললে তাদের মধ্যে একজন বলেন যে উত্তরবঙ্গের কিছু জায়গায় একশ্রেণীর স্ত্রী-সঙ্গী তথাকথিত গুরু **"তুমি রাধা আমি শ্যাম"** এই কথা গোপনে হলেও শিষ্যাদের মধ্যে প্রচার করে শিষ্যাদের সাথে সুযোগ পেলেই যৌনাচারে লিপ্ত হন। তিনি আমাকে বলেন যে কোন এক তথাকথিত গুরু গভীর রাত্রিতে শিষ্যাদের সহ যৌনাচার করতে গিয়ে স্থানীয় যুবকদের রোষানলে পরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপরও নাকি ঐ গুরুর উপর শিষ্য-শিষ্যাদের শ্রদ্ধাবোধ এতটুকু কমেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া দক্ষিণবঙ্গের ২/৩ জন ছাত্রের মুখে শুনেছি তাদের অঞ্চলে একজন গোসাই নাকি বুড়ো বয়সেও স্ত্রী-সঙ্গী ছাড়া রাতে ঘুমাতে যেতেন না। স্ত্রীসঙ্গী তার চাই। শিষ্যরা আর কি করেন, গুরুর কথা নিঃশব্দে মানতে হয়। এভাবে একজন যুবতী তার সঙ্গী হওয়ার ফলে পরবর্তীতে গর্ভবর্তী হয়ে পড়ায় এরূপ অনৈতিক ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে হত দরিদ্র পল্লী অঞ্চলে সরলপ্রাণ—অশিক্ষিত শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলার বিকৃত ব্যাখ্যা করে নিজে কৃষ্ণ-কানাই সেজে কত যুবতী শিষ্যার যে কত সর্বনাশ গোঁসাই নামধারী কিছু লোক করে যাচ্ছে তার হদিশ কে রাখে? আর কেউ রাখলেই বা কি? এরা দলে ভারী।

উভয় বাংলায় এক সময় গোঁসাই নামধারী কিছু লোক নিজে শ্রীকৃষ্ণ সেজে শিষ্যাদেরকে নিয়ে রাসলীলা, বস্ত্রহরণ ইত্যাদি লীলা অভিনয় করতেন। তার মানে গোপনে যৌন লীলায় মেতে উঠতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্যলীলার ধারে কাছেও যেতেন না, এমনকি বর্ণনা করতেও উৎসাহী হতেন না। কারণ

এরা হলেন কামাচারী। তৎকালীন আমলে এরূপ একজন গোঁসাই কিভাবে জব্দ হয়েছিলেন তার বিবরণ হুতোম প্যাঁচার নকশা বইতে পাওয়া যায়।

একবার এক শহুরে গোসাই এক গৃহে বাড়ীর কর্ত্তাদের অনুপস্থিতিতে মেয়েদের সাথে লীলা করবার পর ফেরার সময় কিভাবে অপদস্ত হয়েছিলেন তার কাহিনী বইটীতে আছে। পাঠকদের জানার জন্য তা তুলে ধরা হল ঃ

"একদিন রবিবার বাবুরা বাগানে গিয়েছেন, এই অবকাশে বাড়ির প্রভু,-খন্তি, খোল, ভেপু নিয়ে উপস্থিত; বাড়ির ভেতর খবর গেল। প্রভুকে সমাদরে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল, সকল মেয়েরা একত্র হলেন, চৈতন্য চরিতামৃত ও ভাগবতের মতে বেছে গোছালো গোছালো লীলে আরম্ভ কল্লেন। ক্রমে লীলা শেষ করে গোস্বামী বাড়ী ফিরে যান-এমন সময় ছোট বাবু এসে পড়লেন। ছোট বাবুর কিন্তু সাহেবী মেজাজ, প্রভুকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে গেলেন ও অনেক কষ্টে আন্তরিকভাব গোপন করে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন প্রভু! ভাগবতের মতে লীলে দ্যাখান হল? প্রভু ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা গোছের আজ্ঞা হাঁ করে সেরে নিলেন। ছোট বাবুর কাছে একজন মুখোড় গোছের কায়স্থ মো-সাহেব ছিল, সে বললে, হুজুর! গোঁসাই সকল রকম লীলে করে চললেন, কিন্তু গোবর্ধন ধারনটা হয়নি, অনুমতি করেন তো প্রভুকে গোবর্ধন ধারণটাও করে দেওয়া যায়, সেটা বাকী থাকে কেন? ছোটবাবু এতে সম্মত হলেন, শেষে দরওয়ানদের হুকুম দেয়া হল, দরজার পাশে একখানা দশ বারমন পাথর পড়েছিল, জনকতকে ধরে এনে গোস্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে পাথরের চাপানে গোস্বামীর কোমর ভেঙ্গে গেল। সেই অবধি প্রভুরা ত্যামন ত্যামন স্থলে লীলা কত্তে আর স্বয়ং যান না-প্রয়োজন হলে রকমারী শিষ্যারা স্বয়ং প্রভুর বাড়ি পালকী চড়ে উপস্থিত হন। " বর্তমানে পাল্কীর প্রচলনতো উঠেই গেছে বলা চলে। তবে এখনও কিছু শিষ্যা যে যৌন-লীলা উপভোগ করার জন্য গোপনে তথাকথিত গোঁসাই বাড়ী যান না তা কে হলপ করে বলতে পারবেন? [আবারও বলছি প্রকৃত গোঁসাই/গোস্বামীরা আমাদের নমস্য। তাদের বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলছি না]

আজ দেখি এবং শুনি কিছু গোসাই শিষ্যাদেরকে বলেন যে গুরু হলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ সরাসরি নিজেকে পুরুষোত্তম না বলে শিষ্যাদের মুখ দিয়ে একই কথা বলাতে চান [জানা দরকার যে প্রকৃত গোস্বামীপাদগণ

নিজেরা একথা তো প্রচারই করেন না বরং শিষ্যরা বলতে চাইলে তীব্রভাবে বাধা দেন ও নিষেধ করেন। তারা আমাদের নমস্য।] কিন্তু তাদের ষড় –ঐশ্বর্য কই? ষড়বিধ বিলাস কোথায়?

"কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়বিধ বিলাস।
প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥
অংশ-শক্ত্যাবেশ রূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত প্রকার॥

(চৈ. চ. আদি ২/৯৭–৯৮)

যাক এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখতে গেলে বই এর আয়তন অনেক বেড়ে যাবে। শুধু একটা কথাই বলা যায়, যে সব গোঁসাই নিজেকে স্বয়ং কৃষ্ণ বা পুরুষোত্তম বলে প্রচার করেন তাদেরকে উপরের কাহিনীর মত একটি জড়ীয় গোবর্ধন ধারণ করতে বললে কি করবেন? হয়তো পালিয়ে বাঁচবেন।

কিছু গোঁসাই বাবাজী আছেন যারা শিষ্যদেরকে একাদশী ব্রত, জন্মাষ্টমী, বামণ দ্বাদশী, রামনবনী, নৃসিংহ চতুর্দশী ইত্যদির মত অতি মহিমাপূর্ণ ব্রত-উপবাস পালনে পর্যন্ত নিষেধ করেন। অথচ বৈষ্ণব মাত্রেই এগুলো পালন করা বিহীত কাজ। এসব ব্রত-উপবাসতো সবার জন্যই প্রশস্ত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে–

"একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহ চতুর্দ্দশী ॥
এই সবে বিদ্ধা ত্যাগ-অবিদ্ধাকরণ
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভণ ॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন।
শ্রীমূর্ত্তি-বিষ্ণুমন্দিরকরণ–লক্ষণ ॥

(চৈ. চ. মধ্য ২৪/৩৩৬–৩৩৮)।

কিন্তু বৈষ্ণব নামধারী অনাচারী গোঁসাইদের শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের কথা শোনার দরকার কি? নিজেই তো স্বয়ং ভগবান! তাই একাদশী ব্রতের প্রয়োজন কি শিষ্যদের? কারণ একাদশী ব্রততো হরিবাসর। নিজে হরি! তাই তার সংসর্গে শিষ্যরা থাকলেই তো হরিবাসর হয়ে যাবে! তাই খামাকা কষ্ট করে উপবাসের প্রয়োজন তো পড়ে না। স্বয়ং কৃষ্ণ হওয়ায় তিনি নিজেই তো

আবার রাম, বামন এবং নৃসিংহদেব। তাই এসব উপবাসের দরকার কি? আর **জন্মাষ্টমীর উপবাসেরও দরকার** নেই। নিজের জন্মতিথি –অর্থাৎ আবির্ভাব তিথি শিষ্যরা পালন **করলেই** তো জন্মাষ্টমী তিথি পালন হয়ে যাবে। তাই নয় কি? এরা বাইরে **বৈষ্ণব** বেশধারী হলে হবে কি? মনেপ্রাণে যে স্মার্ত্তমতানুসারী। **এজন্যই** শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে দেখতে পাই–

"সামান্য সদাচার, আর বৈষ্ণব-আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত ব্যবহার।"

(চৈ. চ. মধ্য ২৪/৩৩৯)।

যাঁরা ক্ষুদ্র জীব হয়ে নিজেদেরকে **"পরব্রহ্ম"** (পর শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, আর ব্রহ্ম শব্দের অর্থ–বৃহৎ। **অর্থাৎ যাঁর সমান বা যাঁ অপেক্ষা** বৃহৎ আর কিছুই নেই) বলে মনে করেন অথবা **শিষ্য-শিষ্যাদের কাছে নিজে** ক্ষুদ্র-সাধক-জীব হয়েও সিদ্ধের সমান বলে **পরিচয় দেন তাদের পরিণতি** শেষ পর্যন্ত **"ব্যাঙ ফাটা"** গল্পের ধাড়ী ব্যাঙ-এর মতই হতে বাধ্য। [**দ্রষ্টব্য ঃ উপাখ্যানে উপদেশ** ঃ প্রথম খন্ড, শ্রী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ রচিত, পৃষ্ঠা ১৮] এজন্যই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে –

"জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব-কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।"

(চৈ. চ. মধ্য ১৮/১১৩)।

পরমেশ্বর ভগবান হলেন মায়ার অধীশ্বর–অর্থাৎ তিনি মায়াকে নিয়ন্ত্রণ **করেন**। তাই তিনি কোনক্রমেই মায়ার অধীন নন। অথচ ক্ষুদ্র জীব মায়ার বশীভূত। মায়া দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। এজন্যই শ্রীগীতায় ভগবান বলেছেন **"মম মায়া দুরত্যয়া'**–অর্থাৎ আমার মায়া এমনই শক্তিশালী যে তাকে অতিক্রম করা ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে অসম্ভব। জীবকে কৃষ্ণ জ্ঞান না করার জন্যও মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন।

"প্রভু কহে, –বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিবা!
জীবাধমে কৃষ্ণ–জ্ঞান কভু না করিবা ॥

(চৈ. চ. মধ্য ১৮/১১১।)

কারণ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানকে যদি সূর্য্য ধরা হয় তবে ক্ষুদ্র জীব (জীবাত্মা) হল এই সূর্য্যকিরণের কণামাত্র। ঈশ্বর যদি একটি বিরাট অগ্নি

হন তবে জীবকে তার স্ফুলিঙ্গের এক কণামাত্র বলা যায়। এজন্য জীব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব কখনো সমান হতে পারে না। তাই যারা জীব এবং ঈশ্বরকে সমান জ্ঞান করেন তারা মূঢ় এবং পাষণ্ডী ছাড়া আর কিছুই নয়।

"সেই মূঢ় কহে,–জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেইত' পাষন্ডী হয়, দন্ডে তারে যম ॥"

(চৈ. চ. মধ্য ১৮ / ১১৫)।

পাঠক, এখনতো বুঝতে পারছেন যারা নিজেদেরকে ঈশ্বর নামে অভিহিত হতে চান, যারা নিজেদের গুরুকে ঈশ্বর বলেন শাস্ত্রানুযায়ী তাদের পরিণতি কি হবে? এজন্যই **"যাহার হৃদয়ে প্রকৃত হরিভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি কখনো আপনাকে এই প্রকৃতির বা বিশ্বের ভোক্তা, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর প্রভৃতি কল্পনা করেন না। তিনি আপনাকেঁ গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য-পদ ধুলি রূপেই উপলব্ধি করেন, তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই অকপট দৈন্য বিরাজিত থাকে। জীব কখনই পরব্রহ্ম বা কখনই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হইতে পারে না।"**

এই গোঁসাই নামধারী গুরুব্রুবরা আবার শিষ্য সংগ্রহে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়ে পড়েন। কার কত শিষ্য এই নিয়েও নিজেদের মধ্যে অলিখিত অথচ মনের দিকে থেকে ঠান্ডা লড়াই চালিয়ে যান। এজন্য দেখা যায় পাত্র-পাত্রী বিচার না করে এরা নির্বিচারে শিষ্য-শিষ্যা সংগ্রহ করেন। ভাবখানা এই আমার কতজন শিষ্য, অমুক গুরুর শিষ্য আর কত? অনেক সময় এই মনোভাব শিষ্যদের মাঝেও প্রকাশ করে ফেলেন। দেখা দেয় বিপত্তি। এক গুরুর শিষ্যের সাথে অন্য গুরুর শিষ্যদের চলে বাদানুবাদ–শেষে ঝগড়া-মারামারি কাটাকাটি-এই আর কি। এটি এক ধরনের গুরু নিন্দাবাদ নয়? সরাসরি অন্য গুরুর নিন্দা না করে পরোক্ষে শিষ্যদেরকে উসকানি দিয়ে অন্য গুরুকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয় কি?

শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে–

"ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান নৈবাভ্যসেদ্ধহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভারভেৎ ক্কচিৎ ॥"

(শ্রীমদ্ ভাগগত ৭/১৩/৮)।

– অর্থাৎ প্রলোভন দ্বারা কাহাকেও শিষ্য করিবে না; বহু গ্রন্থের অভ্যাস করিবে না; শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ ও মহারম্ভাদির উত্তম পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু কে শোনে শাস্ত্রের কথা। তথাকথিত জাঁত গোসাইরা শিষ্য সংগ্রহে কোন বাচবিচার না করে শিষ্য-শিকারেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

একজন মহান বৈষ্ণব শ্রী হরিদাস দাস বলেন ঃ **"স্বসম্প্রদায় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনধিকারী শিষ্যকে সংগ্রহ করিবেন না। শিষ্যকরণে আসক্তি-ত্যাগাদি সন্নাসধর্ম হইলেও নিবৃত্তিমার্গের ভক্তগণেও প্রযোজ্য। শ্রীনারদাদি শিষ্য করিয়াছেন; আদৌ শিষ্য না করিলে সংপ্রদায়লোপ ও জ্ঞানশাঠ্য হয়; অতএব জাতরতি সাধুগণই শিষ্য করবেন; ফলত অনধিকারী বহু-শিষ্যকরণই নিষিদ্ধ। তদ্রুপ ভগবদ্‌বহির্মুখ বহু-শাস্ত্রাভ্যাসও বর্জনীয়। ভগবদ্বিমুখতাজনক কোন কার্যই করণীয় নহে।"**

[উৎস ঃ শ্রী হরিদাস দাস ঃ বৈষ্ণব অভিধান ১ম খন্ড পৃঃ ৭৮১]

জাত গোঁসাইদের মধ্যে বেশীরভাগকেই পার্থিব (জড় জাগতিক) বিষয়ে আসক্ত দেখা যায়। জড়ভোগে আসক্ত এই সব গুরুনামধারীর শিষ্য-শিষ্যারাও নিজেদের সংসার ও দেহে আসক্তি পুরাপুরি বজায় রেখে প্রবলভাবে সাধন -ভজনের অভিনয় করে মাত্র। এই অবস্থায় কখনো তারা পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎ প্রেম লাভ করতে পারে না [পঞ্চম পুরুষার্থ মানে ঃ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ– এই চতুবর্গের পরও যে কৃষ্ণ প্রেম তাকেই পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎ প্রেম বলে] নৌকার নোঙ্গর না তুলে মাঝি যদি হাল ধরে বসে থাকে আর দাড়িগণ দিবারাত্রিও দাড় টানে তবে নৌকা যেখানে ছিল সেখানেইতো থেকে যাবে। এখানে নোঙ্গর হল জড়জাগতিক বিষয়ে আসক্তি। মাঝি হলেন গুরুনামধারী অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব। দাঁড়িগণ হলেন গুরু-নামধারীতে বিশ্বাসী শিষ্য- শিষ্যাগণ। আর দাড় টানা হল সাধন-ভজনের চেষ্টা।

জাঁত গোঁসাইদের মধ্যে অনেককেই ধর্ম ব্যবসায়ী, মন্ত্র ব্যবসায়ী ও ভাগবত ব্যবসায়ী হতে দেখা যায়। কারণ এরা ধর্মের নাম করে নিজের আখের গোছায়। যাকে তাকে মন্ত্র দান করে শিষ্য-শিষ্যাদেরকে আর্থিকভাবে শোষণ করে। আবার ভাগবত-পাঠ শুনিয়ে অর্থ উপার্জন করে। এই সব কিছুই করে এরা নিজেদের সংসার নির্বাহের জন্য। এরা নিজেদের এসব কাজের বৈধতার জন্য প্রায়শঃ যুক্তি দেন যে সাধু-সন্যাসীরাও তো হরিনাম

প্রচারের সময় অর্থ সংগ্রহ করেন; মন্দির-মঠ এবং বিগ্রহের জন্য বিত্তশালীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। তাই সংসার চালানোর জন্য নিজেরা (জাত গোসাই) অর্থ সংগ্রহ করাতে দোষের কি আছে? কিন্তু এখানেই কথার শুভঙ্করী ফাঁকি। একদল অর্থ সংগ্রহ করছেন পরমেশ্বর ভগবানের সেবার জন্য, আর অন্যদল করছেন শুধু নিজের এবং পরিবারের সুখভোগের জন্য। গোস্বামীদের মধ্যে যারা অর্থ সংগ্রহ করে ভগবৎ সেবায় ব্যয় করেন তাঁরা অবশ্যই আমাদের নমস্য। যারা মাৎসর্য্যপরায়ণ, (অন্যের দোষত্রুটীই খোজে বেড়ান, নিজেরটা দেখেন না) কামুক ও নির্বিশেষবাদী এবং প্রকৃত সাধুগণকে **"লোভী"** বলে নিজেদের অসৎ চরিত্রকে গোপন রাখার চেষ্টা করেন তাদের সম্পর্কেই উপরোক্ত অভিযোগ আমরা রাখছি। প্রকৃত গোঁসাই এবং গোস্বামীগণের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে কেন? কারণ তাঁরাতো ভগবদ্ ভক্ত। একজন বৈষ্ণব মহাজন শ্রীপাদ শ্রী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ–এর নিম্নোক্ত মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ঃ

"সদ্‌গুরু ও তথাকথিত গুরু, শুদ্ধভক্তি ও ছল-ভক্তি, প্রেম ও কাম, ভক্তি ও ভোগ, হরিভজন ও কপটতা, বাহিরে দেখিতে অনেক সময় দুধ ও চূর্ণ গোলার মত–এক বলিয়া মনে হয়; এমন কি, নকল ও কৃত্রিম দ্রব্যগুলি প্রকৃত দ্রব্য অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর ও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। খাঁটি দুধ অপেক্ষা চুন গোলা অধিক ঘন, আসল সোনা অপেক্ষা মেকী সোনা অধিক উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়।" এজন্যই দেখা যায় দেশের গ্রামে-গঞ্জে খাটী গোঁসাই/গোস্বামীদের চেয়ে ভণ্ড,প্রতারক, কামুক এবং প্রতিষ্ঠাকামী তথাকথিত জাঁত গোঁসাই/গোস্মমীদের দাপট অনেক বেশী। এরাই চুন-গোলা, খাঁটী দুধ নয়।

তথাকথিত জাঁত গোসাইদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা বাইরে বৈষ্ণব বেশ ধারণ করেও মনে প্রাণে সুবিধাবাদী। এরা যখন যেমন তখন তেমন–এই নীতিতে বিশ্বাসী। তাদের মধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে কামনারূপ চতুবর্গে আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছা আছে। আর এর বশীভূত হয়ে তারা সুবিধাবাদী নীতির দাস হয়ে পড়েন। তাই এদের মধ্যে অনেকে নিজেকে সমন্বয়বাদী বলে দাবী করেন। এরাই শেষ পর্যন্ত সৎ ও অসৎ, চেতন ও অচেতন, মায়া ও ভগবান-সব কিছুকেই একাকার করে ফেলেন। এরূপ

সুবিধাবাদী সমন্বয়বাদীরা মুখে বলেন **"সকল মতই ভাল"**। কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তি মত ভাল হইলে অন্য মতগুলিকে যখন আর তার সমান বলে স্থাপন করা যায় না–অর্থাৎ যখন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুবর্গের উর্ধ্বে পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমকে সমান আসন দেয়া যায় না–এরূপ প্রমাণ হয়, তখন এরা নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেন। তখনই দেখা যায় এরা কেবল সুবিধাবাদ বা নিজের ইন্দ্রিয়ের খেদমত্গার (চাকর)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজ-ভক্ত শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করে এই তথাকথিত সমন্বয়বাদের মধ্যে যে সব কপটতা আছে তা জগতের জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন।

"প্রভু বলে,–ও বেটা যখন যেথা যায়।
সেই মত কথা কহি তথায়ই মিশায় ॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাম্ভায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায় ॥
ভক্তি হৈতে বড় আছে,–যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥"

(চৈ. ভাগবত মধ্য ১০/১৮৮–১৯১)।

এক শ্রেণীর জাঁত গোসাই আছেন যারা গোপনে হলেও প্রচার করেন যে, হরি ভজনের পাশাপাশি স্ত্রী-সঙ্গও করা যায়। এরাই বাংলার প্রবাদ বাক্য **"ডুডও (দুধ) খাব টামাকও (তামাক) খাব"**–এই নীতি অনুসরণকারী। এরাই হরিকীর্ত্তন উৎসব ইত্যাদিকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উৎসব মনে করে ধর্ম ও অধর্ম উভয় রাজ্য থেকেই আনন্দ লোটার চেষ্টা যুক্ত। কিন্তু শাস্ত্র মতে একসঙ্গে তো দুইদিক রক্ষা হতে পারে না।

কোন কূপের জল যদি একেবারেই নষ্ট হয়ে খাবারের অযোগ্য হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পিতৃপুরুষের কুপ বলে ঐতিহ্য রক্ষার জন্য বংশানুক্রমে কোন পরিবার তাই গ্রহণ করতে থাকে তবে নিশ্চিতভাবে নানাব্যধির স্বীকার তারা হতে বাধ্য। এমনকি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক হতে পারে।

আমাদের গ্রামদেশেও জাত গোঁসাইর অর্থাৎ কুল-গোসাইর কাছ থেকেই মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে–এরূপ মনোবৃত্তি অনেকের মধ্যেই রয়েছে। এই ধরনের একগুয়েমি মনোভাব পিতৃপুরুষের কূপ থেকে বংশানুক্রমে জল গ্রহণের মতই অনেকটা বলা যায়। তাদের পিতৃপুরুষেরা যখন কোন গোঁসাইর কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন, হতে পারে সেই মন্ত্রোপদেষ্টা সত্যসত্যই প্রকৃত গোস্বামী ও সদ্‌গুরু ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যদি তার ব্যতিক্রম ঘটে–অর্থাৎ ঐ গোস্বামীর বংশধরগণ সংসারে আসক্ত এবং স্ত্রী-সঙ্গী মনোভাবী হয়ে পড়েন তাহলে পূর্বের নজির বা উদাহরণ দেখিয়ে এরূপ গুরুনামধারী কোন ব্যক্তির কাছে আশ্রয় গ্রহণ কখনো নিত্যমঙ্গলকর হতে পারে না।

অনেকে **"কূল গুরু পরিত্যাগ করা অপরাধ"**–এরূপ মেয়েলী শাস্ত্রের কথা বলে অসৎ ব্যক্তিকেও "গুরু" বলে স্বীকার করেন। এতে এসব শিষ্যের কোনদিন মঙ্গল হয় না। বৈষ্ণবকূল চূড়াশিরোমণী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলতেন, **"ডাক্তারের পুত্র সকল সময় ডাক্তার হয় না। অতএব ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারি না পড়িলেও তাহাকে ডাক্তার কল্পনা করে যদি বিসূচিকা (কলেরা) ব্যধির চিকিৎসা করিবার জন্য তাহার ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দর্শণী প্রদান করিয়া আহ্বান করা হয়, তাহা হইলে রোগী নিরাময় হওয়া দূরে থাকুক, মৃত্যু মুখেই পতিত হইয়া থাকে।"** তাই কূল গুরু নামধারী কোন ব্যক্তি অসদাচারী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পুরুষের প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করতে যেয়ে এদেশের কত সরল ও নিরীহ ব্যক্তি তাদের কাছে তথাকথিত আশ্রয় নিয়ে যে নিজেদের ইহকাল ও পরকালের চূড়ান্ত সর্বনাশ করেছে এবং করছে তার খবর কে রাখে? এজন্যই পূর্বোক্ত বৈষ্ণব মহাজন বলতেন, **"আর সুলার নাদী–মিশ্রিত অতি পুরাতন ডাল, যাহা কোনদিনই সিদ্ধ হইবে না, তাহা বাড়ীর নিকটে মুদি-দোকানে পাওয়া যায় বলিয়া অলস ব্যক্তি ব্যতীত অপরে কখনই তাহা ক্রয় করে না। যে-স্থানে উৎকৃষ্ট ডাল পাওয়া যায়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া সে-স্থান হইতেই উহা ক্রয় করে। যাহারা নিজেদের মঙ্গল-লাভের প্রতি উদাসীন, অত্যন্ত জড় ও আরাম প্রিয়, কেবল তাহারাই সদ্ গুরু অনুসন্ধান করে না।"**

[দ্রষ্টব্য ঃ উপাখ্যানে উপদেশ ঃ প্রথম ভাগ, শ্রী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ]

গ্রামে আমি দেখেছি জাঁতগোসাই এবং তদীয় শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই নিজেদেরকে নরোত্তম পরিবার, শ্যামানন্দ পরিবার, নিত্যানন্দ পরিবার, শ্রী অদ্বৈত পরিবার, শ্রী গদাধর পরিবার, শ্রীনিবাস পরিবারভুক্ত বলে পরিচয় দেন। সব কিছুই ঠিক আছে যদি গুরু পরম্পরা শুদ্ধ প্রণালীর হয়। কারণ কেউ যদি স্পষ্টদায়িক সম্প্রদায়ের শ্রীরূপ কবিরাজের শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমে এসে শ্রীনিবাস পরিবার রূপে পরিচয় দেয় তাহলে তা মেনে নেয়া যায় না। কারণ রূপ কবিরাজ গুরুদ্রোহী ছিলেন বলে তাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। তেমনিভাবে কেউ যদি শ্রীঅদ্বৈত পরিবার বলে নিজেকে পরিচয় দেয় অথচ তার গুরু পরম্পরা ক্রমে দেখা গেল শঙ্কর পাগল, বাসুদেব শৃগাল, প্রমুখ রয়েছেন, তবে তিনি অদ্বৈত পরিবারভুক্ত হতে পারেন না। কারণ এসব লোক গুরুবাক্য অমান্য করায় গুরু কর্তৃক (শ্রী অদ্বৈতপ্রভু) অনেক আগেই ত্যাজ্য হয়েছেন।

গরুর শরীর থেকে দুধ ও গোবর উভয়ই নির্গত হয়। তাই কোন মুর্খ্য ব্যক্তি কুযুক্তি প্রদর্শন করে বলতে পারে একই গরু থেকে নির্গত বলে গোবর ও দুধ একই জাতীয়। এ হল এক ধরনের অজ্ঞতা। অনুরূপভাবে কোন বৈষ্ণবের হরিভজন-পরায়ণ পুত্র ও হরিভজন-বিমুখ পুত্রকে, সদ্‌গুরুর প্রকৃত শিষ্য ও শিষ্য নামধারী কপট ব্যক্তিকে এক মনে করাও মুর্খতা ও বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন অদ্বৈত প্রভুর পুত্র শ্রীল অচ্যুতানন্দ ছাড়া অপরাপর যেসব পুত্র শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর বিচারের বিরোধ করেছিলেন (তারা মূলতঃ জ্ঞানমার্গী ছিলেন), এই উভয় শ্রেণী বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রী অদ্বৈত প্রভুর পুত্র বলে পরিচিত থাকলেও তাদের দ্বারা একই আদর্শ প্রদর্শিত হয় নাই। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রী ঈশ্বর পুরী এবং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ছিদ্র অন্বেষণকারী, **"গুরুর উপর গুরুগিরি"** করবার দাম্ভিকতাযুক্ত নির্বিশেষবাদী শ্রীরাম চন্দ্র পুরী বাহ্য দৃষ্টিতে একই গুরুর শিষ্য বলে পরিচিত হলেও উভয়ের চিত্ত বৃত্তি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তাই কোন জাঁতগোসাই যখন **"আমি অমুক বৈষ্ণব মহাজনের পরিবার"** বলে শিষ্যদের কাছে প্রচার করেন তখন তাঁর গুরুপরম্পরা শুদ্ধ কিনা তা অবশ্যই বিচার্য্যের বিষয়। উঁচু পরিবারভুক্ত বলে নিছক দাবী করলেই হবে না। কারণ তাঁর পরম এবং পরাৎ গুরুবর্গের মধ্যে এবং এমনকি নিজের মধ্যেও উপরোক্ত ধরনের খাঁদ আছে কিনা তাও বিচার্য্য বিষয়।

তাই পরিবারের প্রধান অতি শুদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য থাকলেও যদি মাঝখানে তার শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে কেউ জ্ঞানমার্গী, আউল-বাউল ইত্যাদি মতানুসারী হন তবে ঐ গুরু পরম্পরা শেষোক্ত পর্যায় থেকেই অশুদ্ধ হয়ে যাবে বলা যায়। তাই গুরু পরম্পরা পুরাটা শুদ্ধ হলেই কেবলমাত্র বলা সঙ্গত হবে যে আমি অমুক পরিবারভুক্ত। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাদীক্ষাহীন সাধারণ লোক তো দূরের কথা, শিক্ষিত লোকেরাও এ বিষয়ে খুব একটা জানেন না, বা খোঁজ খবর রাখেন না। আর এই অবস্থায় জাঁত গোঁসাইদেরতো পোয়া বারো। তারা একজন মহান বৈষ্ণব আচার্য্যকে নিজের পরিবার প্রধান বলে প্রচার করেন। আর শিষ্যদেরকে যেনতেন ভাবে গুরু পরম্পরা বলে দেন। এতে শিষ্যরা গৌরবে আটখানা। মনে ভাবেন কতবড় পরিবারের আমি আশ্রিত হয়েছি। এ নিয়ে আবার বিভিন্ন পরিবারের আশ্রিত শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে অনেক সময় তর্কবিতর্কেও লিপ্ত হয়। সবাই নিজের পরিবারকে উত্তম বলে দাবী করার চেষ্টা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেক সময় বৈষ্ণব অপরাধ করে বসে। অনেক সময় এরূপ তর্কের পরোক্ষ মদ্‌দাতা হিসাবে কিছু কিছু জাত গোঁসাইকে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এজন্য দেখা যায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিষয়ভোগী লোকেরাই বর্হিবিষয়ে আসক্ত কামীগণকে গুরুরূপে বরণ করে। এসব জাত গোঁসাইদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে যে মোহ-গর্তে পড়তে হবে-এরূপ বিচারবুদ্ধি বা আত্মমঙ্গলাভের বুদ্ধি-বিবেক বহুলোকেরই নাই। শ্রী প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরন করা যায়।

'ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বর্হিরথ মানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা–
স্তেহপীশতন্ত্র্যামরুদাম্নি বদ্ধা॥"

(শ্রীমদ্ভাবগত ৭/৫/৩১)।

–অর্থাৎ যাদের মন বিষয়ভোগের দ্বারা দুষ্ট এবং যারা বর্হিবিষয়ে আসক্ত কামীগণকে গুরুরূপে বরন করেছে তারা পরম-পুরুষার্থ লাভ করতে ইচ্ছুক বৈষ্ণবগণের একমাত্র গতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা জানে না। তাই অন্ধ ব্যক্তি দ্বারা চালিত অন্য অন্ধ ব্যক্তিগণ যেরূপ প্রকৃত সত্য-পথের সন্ধান না

পেয়ে গর্তে পতিত হয়, সেরূপ বর্হিমুখ ব্যক্তিগণও কর্মকান্ডাত্মক বেদরূপ সুদীর্ঘ রজ্জুর সংহিতা-ব্রাহ্মণাদিরূপ মহাসূত্রে কর্মদ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ছোট বেলায় দেখেছি যাত্রাদলে নারদ ঋষির ভূমিকায় অভিনয়কারী একলোক গদ্‌গদ্ হয়ে নারায়ণ নারায়ন বলতে থাকতেন। কারণ নারদের মূল কাজই হল বীনা বাজিয়ে ভগবান নারায়ন–এর মহিমা ও যশ অনবরত কীর্ত্তন করা। ঐ ব্যক্তি সুনিপুণ অভিনেতা ছিলেন। তাই দর্শকদেরকে মোহিত করার জন্য তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝড়াতো। মানুষ এই দেখে আবেগে উদ্বেলিত হতো; মনে করতো ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই শুদ্ধ ভগবৎ ভক্ত। আসলে ব্যক্তিগত জীবনে ঐ ব্যক্তি ছিল একজন মৎস-মাংসভোজী, দুশ্চিরত্র এবং নেশাখোর। এখন কথা হল যাত্রাদলের নারদ এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ গুরুদেব নারদ কি এক? জাত গোসাই নামের কিছু লোক আছেন যারা নিজেকে এবং সাধারণ লোকদেরকে বঞ্চনা করছে; এদের দিব্যজ্ঞান লাভের কোন প্রচেষ্টা নেই; এরা কেবল ভক্তির কাঁচ পড়ে থাকে। এরাই নিজেদেরকে গুরু, গোস্বামী, ধর্ম্ম প্রচারক ইত্যাদি বলে অন্য কার্য্যে আসক্ত; এরাই কামিনী-কাঞ্চন এবং সমাজে সম্মান, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার লোভে ধার্ম্মিকের সাজ পরিধান করে। এরাই ভক্তির মুখোশ ও পরচুলা পরে যাত্রা দলের নারদের মত অভিনয় করে। ফলে এদের কেউ প্রকৃত ভক্ত নয়, বরং কপট ব্যক্তি। কারন যেন-তেন ব্যক্তি ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য করতে পারে না। কৃষ্ণের সাক্ষাৎ নিজ-শক্তি বা নিজের জন (প্রকৃত কৃষ্ণ ভক্ত) ছাড়া কেবল অবৈধ অনুকরণ করে কোন লোক হরিকীর্ত্তনকারী গুরুদেব বা শুদ্ধভক্তি-ধর্ম-প্রচারক হতে পারেন না। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

"কলিকালের -ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ৭/১১)।

জাঁত গোসাইদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি আছেন যারা নিজের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য ইত্যাদি ষড়রিপুর চঞ্চলতা থাকা সত্ত্বেও প্রেম-ভক্তি রাজ্যের বড় বড় কথা আলোচনা করেন। যে সব গ্রন্থ পাঠে তাদের অধিকার এখনও হয় নাই, তা অগ্রাহ্য করে কৌতুহল বশে সে সব গ্রন্থ পাঠের অভিনয় করে। অথচ যে সব গ্রন্থ আলোচনা (যেমন শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা,

শ্রীচৈতন্য ভাগবত ইত্যাদি) করলে, যে সব বিষয় কীর্ত্তন ও স্মরন করলে ক্রমে ক্রমে নিজেদের মঙ্গল হবে, তারা তা করে না। তারা শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা (?) শ্রবণ ও কীর্ত্তনের চেষ্টা লোকসমাজে দেখানোর চেষ্টা করে। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, প্রমুখ বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলী এবং শ্রী জয়দেবের গীতগোবিন্দ, রাসপঞ্চাধ্যায় ইত্যাদি গ্রন্থ-পাঠের অভিনয় করে অনধিকার চর্চা করে। এদেরকেই বৈষ্ণব মহাজন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর "ইচড়ে পাকা বোষ্টম" বলেন। এরা নিজেরা শুদ্ধ সাধন-ভজনে নিয়োজিত না হয়ে রস আস্বাদক ভোগী হতে চায় বলেই এদের চেতনের বৃত্তি বিকশিত হয় না এবং তাদের কোন বৃত্তিই কৃষ্ণ সেবায় লাগে না। এরূপ ইচড়ে পাকা জাত গোঁসাইরা প্রকৃত বৈষ্ণবদেরকে শুষ্কজ্ঞানী বলে আখ্যা দেয় এবং নিজেদেরকে "রসে ডগমগ" কল্পনা করে। এরা আসলেই ভক্তিরাজ্যের জঞ্জাল।

যারা নিজেরাই পুঁজা লাভের জন্য লালায়িত, তারা রাক্ষসরাজ রাবনের ন্যায় উচ্চ সম্মান লাভের আশায় চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত আত্মবিনাশই লাভ করে। যারা কনক (ধনসম্পদ), কামিনী (সুন্দরী মহিলা) এবং প্রতিষ্ঠাকে ভোগ করতে চায়, তারাই কুকর্ম্মী। এদের সব কিছুই কানাকড়ির ন্যায় নিরর্থক। এই কানাকড়ি দিয়ে কখনো বৈকুন্ঠ-লাভ করা যায় না। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন–

তোমার কনক, ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব ॥
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা ত'নহে কভু অনিত্য বৈভব।"

বৈষ্ণব নামের কিছু গোঁসাই আছেন যারা মৎস-মাংস ভোজন করেন। এদের মুখেই শুনা যায়–

"খাইও মৎসের ঝোল, শুইয়ো রমনীর কোল
তবু বল হরি বোল।"

–অর্থাৎ অবাধে স্ত্রীসঙ্গ করে মৎস-আদি ভোজন করেও হরিবোল বললেই বৈষ্ণব হওয়া যাবে। কোন পাপ হবে না। এই ধরনের গোসাইরা

খাদ্যখাদ্যাদি যেমন বাচ বিচার করেন না, তেমনি শিষ্য-শিষ্যাদেরকে এ ব্যাপারে কোন বিধি-নিষেধের কথা বলেন না। আবার কেউ কেউ নিজে কিছুটা সদাচারী। কিন্তু শিষ্যদেরকে এই ব্যাপারে কোন বিধি নিষেধ পালনের শর্ত প্রদান করেন না। কারন হয়তো এই যে তাহলে শিষ্য-শিষ্যা পাওয়া মুশকিল হয়ে যেতে পারে। এরা সবাই প্রতিষ্ঠাকামী বলা যায়।

এ ব্যাপারে আমি নিজে অনেককে জিজ্ঞেস করেছি। বেশীরভাগই বলেন, খাদ্যাখাদ্য বড় বিষয় নয়, মন হল আসল। তাছাড়া **"একবার হরিনাম নিলে যত পাপ হরে জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে?"** –এই আপ্তবাক্যও দুই-একজন বলেন। যারা চালাক এবং কিছু পড়াশুনা করেছেন তারা মহাত্মা শিশির কুমার কর্ত্তৃক লিখিত **"অমিয় নিমাই চরিত"** গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে বলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভুতো মাছ খেতেন। তাহলে আর দোষ কোথায়? আবার অতি ধুরন্ধর কিছু গোসাই শ্রী চৈতন্য ভাগবত–এর কথা বলেন। যুক্তি দেন যে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু দিনে তিনবার খেতেন এবং তিনি মৎস -মাংস ভোজনও করতেন-একথা শ্রী অদ্বৈত প্রভুর মুখ দিয়েই বের হয়েছে।

"মৎস খায় মাংস খায় কেমত সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাঙ আমি দিগবাসী।
তারে বলি সন্ন্যাসী যে কিছু না চায়।
বোলায় সন্ন্যাসী দিনে তিনবার খায়।
অবধুত করিব সকল জাতি নাশ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হইল প্রকাশ ॥ "

(বি. দ্র. অবধূত বলতে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুকে বুঝায়)

[**শ্রীচৈতন্য ভাগবত ২৪ অধ্যায় পৃঃ ৩৩২,** শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত দেবসাহিত্য কুটীর, জুন ১৯৮১]

কি চালাকি যুক্তি! সাধারণ লোকেতো বিশ্বাস করবেই এবং ভাববে মাছ-মাংস খেয়েও বৈষ্ণব ধর্মমত অনুসরন করা যায়। এমনকি মদ্ পান করলেও। কারণ নিত্যানন্দ প্রভুত্তো মদ্যপ ছিলেন। কি পাষন্ডী কথা! মনে ভাবলেও অনন্তকাল নরকগামী হতে হবে।

আসল কথা হল একদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রী অদ্বৈত প্রভুর বাড়ীতে তাঁর বিশ্বরূপ তাকে দর্শন করান। ঐ সময় নিত্যানন্দ প্রভুও সেখানে উপস্থিত হন।

বিশ্বরূপ দর্শন করে দুইজনেই সুখে এমন মত্ত হয়ে যান যে একে অন্যকে ভাবের গালাগালি (সাধারণ গালাগালি নয় কিন্তু) দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে ভাবের এমন আবেশ হয় যে শ্রী অদ্বৈত প্রভু দিগম্বর হয়ে যান এবং তরজা করে (বৈষ্ণব শাস্ত্রে একে সাংকেতিক ভাষা বলে) বলেন যে নিত্যানন্দ হলেন এমন সন্ন্যাসী যে মৎস খায়, মাংস খায় এবং সে মদ্যপের মত আচরণ করছে। এসবই ছিল প্রেমের কলহ, আসল কলহ নয় বা আসল বক্তব্য নয়। এর মর্ম সাধারণ লোকের পক্ষে অনুধাবণ করা সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্য ভাগবতেই এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে–

"ঈশ্বরে সে ঈশ্বরের কলহের পাত্র।
কে বুঝয়ে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলামাত্র।"

তারপরও কিছু বৈষ্ণব মহাজন **"মৎস খায় মাংস খায়"**-এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন ঃ "যোগ পক্ষে ইহার ব্যাখ্যা করিলে আর ব্যবহারিক দোষ হয় না। যথা-গঙ্গা ও যমুনায়–ইড়া ও পিঙ্গলার শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ যে মৎসদ্বয় বিচরন করিতেছে, যিনি সেই শ্বাস-প্রশ্বাসকে পুরক, কুম্ভক ও রেচকে আয়ত্ত করিয়াছেন, অথবা যে প্রাণায়াম-পরায়ন যোগী সুষুম্না পথে জীবাত্মা-পরমাত্মায় সম্মিলিত করিয়াছেন, তিনিই মৎস ভক্ষণ করেন।

মা শব্দে রসনা। রসনাকে বিপরীত পথে তালুতে চালিত করিয়া যোগী ব্রহ্মরন্ধ্রিত ঃ ক্ষরিত সুধা পান করেন, উহাকে মাংস ভক্ষণ বলা হইয়াছে। যোগপথে এইরূপ ব্যাখ্যায়–মহাযোগী অনন্তদেবের পক্ষে মৎস্য–মাংস ভক্ষণের কার্য দোষাবহ নহে। ব্যবহার পথেও পরমহংস শিরোরত্ন শ্রী নিত্যানন্দের কোন কার্যই দোষাবহ নহে। তিনি সে অবস্থায় স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ তাঁহার মাতা পিতা বা বর্নাশ্রম কিছুই নাই, তিনি সকলের অতীত।" [**উৎস ঃ শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত, ব্যাখ্যা ও বক্তব্য পৃঃ ৫৪৪**]

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন অনন্তদেবের তথা শ্রীবলরামের অবতার। অনন্তদেব মহাযোগী। মহাযোগী যোগাভ্যাসের ভিত্তিতে প্রানায়ামের মাধ্যমে তিনটি নাড়ী ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্নাকে ব্যবহার করে উপরোক্ত কাজ যোগপন্থায় অনায়াসেই করতে পারেন। তাই নিত্যানন্দ প্রভুর মাংস-ভোজন-এর বিষয়টি যা অদ্বৈত প্রভু বলেছেন তা হল যৌগিক।

শাস্ত্রে আছে রজঃগুণ এবং তমোগুণ সম্পন্ন আহার ভক্তি পথের প্রতিকূল। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে–

"যে যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে
মৎস্যাদঃ সর্ব্ব মাংস্যাদস্তস্মান্মৎস্যান বিবর্জ্জয়েৎ ॥ "

– অর্থাৎ যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি তার মাংস খাদক বলেই কথিত হয়, কিন্তু মৎসভোজী হলেন সর্বমাংসভোজী (যেহেতু মৎস গরু-শুকরাদি, যাবতীয় প্রাণিমাত্রই ভোজন করে; তাই এক মৎস ভোজনে সর্বমাংসই ভুক্ত হয়)। তাই মৎস ভোজন সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য (মনুসংহিতা ৫/১৫)।

এখন বলা যায় কিছু ধুরন্ধর গোসাইর বক্তব্যও ধোপে টিকে না। নিজেদের জিহ্বার বেগ দমন করতে অক্ষম এসব গুরুব্রুব তাই মৎস-মাংস নিজেরা যেমন ভোজন করেন তেমনি শিষ্যদেরকে এ ব্যাপারে কোন নিষেধ করেন না। অথচ এরূপ আচরণ বৈষ্ণব সদাচারের একান্ত বিরুদ্ধ বলা যায়।

জাঁত গোসাইদের মধ্যে আবার অনেকেই বিভিন্ন পাঠ-কীর্ত্তনাদি করে থাকেন। এদের মধ্যে প্রায় সবাই গৌরলীলার কথা না বলে রাধাকৃষ্ণের লীলা বলতে বেশী ভালবাসেন। তাতেও তেমন একটা আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা না বলে রাসলীলা, বস্ত্রহরণ লীলা, নৌকা বিলাস, রাধার মানভঞ্জন ইত্যাদি বলতেই বেশী আগ্রহী দেখা যায়। জড়দেহী, ভোগলালসায় উন্মুখ, অন্নগত প্রাণ, যোনিগত মন ইত্যাদি ধরনের মানুষই যে ঐ ভাগবত পাঠের শ্রোতা তারা মনে হয় ভুলে যান। রাসলীলাসহ উপরোক্ত লীলাসমূহ অত্যন্ত উচ্চমানের। কেবলমাত্র অবিকারগ্রস্থ মনের মানুষদের সামনেই ঐসব লীলাকীর্তন করা উচিত, পাঁচ মিশেলী লোকের সামনে নয়। এতে ঐসব লীলার মধ্যে কোন শ্রোতার মনে যদি অজান্তেও যৌন রস জাগ্রত হয় তবে তাদের মহাঅপরাধ কি হবে না? আর গোঁসাই যিনি ভাগবত পাঠক-তার যে কি অপরাধ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এসব গোঁসাই নামধারী ভাগবত পাঠকেরা হয় সজ্ঞানে না হয় অজ্ঞানে এভাবেই পাঠ করে যান। এতে সমাজে অনর্থবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনাই বেশী। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। একবার শ্রীমদ্

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে একজন লোক প্রশ্ন করেছিলেন, গৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তন আপনারা করেন না কেন? উত্তরে সরস্বতী ঠাকুর বলেছিলেন, মঠে পাঁচমিশালী (বিভিন্ন ধরনের) লোকের সমাগম হয়। লীলাকীর্ত্তন একমাত্র প্রকৃত ভগবৎ ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সাধারণ লোক লীলাকীর্ত্তন শুনে যৌনরসে আপ্লুত হতে পারে যা মহা অপরাধের সামিল। এতে কীর্ত্তনিয়া এবং সাধারণ শ্রোতা উভয়ের জন্যই অমঙ্গলজনক হতে পারে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। গোঁসাইজীরা তাদের মনমতো ভাগবত পাঠ করে যাবেনই! আর কেউ পরামর্শ দিলেতো কথাই নেই। তাকে রাধাকৃষ্ণের বিরোধী আখ্যা দিতেও মনে হয় কুণ্ঠিত হবেন না। এদের সম্পর্কেই শ্রীকালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয় উপহাস করে মন্তব্য করেন ঃ **"বর্তমান দলেরা শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করে না, গলাটা সাধা, চানক্য শ্লোকের দু'আখর পাঠ, কীর্ত্তন অঙ্গের দুটো পদাবলী মুখস্থ করেই মজুরা কত্তে বেরোন ও বেদীতে বসে ব্যাসবধ করেন।"** অর্থাৎ ব্যাসাসনে বসে যেখানে পাঁচমিশালী বা সাধারণ লোকজনের কাছে গৌরলীলা সহ শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা, কালীয়দমন, অসুরাদি নিধন, গিরি গোবর্ধন ধারণ ইত্যাদি লীলা কীর্ত্তন করা উচিত, সেখানে তারা ভাগবতের দশম স্কন্ধকেই আলোচনার জন্য বেছে নিলেও শেষ পর্যন্ত বস্ত্রহরণ, রাসলীলা, নৌকা বিলাস ইত্যাদিতে নিজেদের ব্যস্ত রাখতে আগ্রহী ও ভালবাসেন। আর এই সুবাদে সময়-সুযোগ পেলে নিজেই কৃষ্ণ সেজে গোপনে নারীদের–বিশেষ করে যুবতী শিষ্যাদের সাথে বস্ত্র হরণ ও রাসলীলার অনুকরণ করতে কুণ্ঠিত হন না। কারণ নিজে তো কৃষ্ণ ! তাই কৃষ্ণকে অনুকরণ না করলে কি চলে?

জাত গোঁসাইদের মধ্যে বেশীরভাগের বেলায়ই শাস্ত্রীয় লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। এরাই কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। কোন মহাত্মা বা বৈষ্ণব মহাজনের প্রভাব দেখে এদের মধ্যেই মাৎসর্যভাবের (হিংসার) উদ্রেক হয়। মনে করেন শিষ্য যদি অমুক মহাত্মা বা বৈষ্ণব মহাজনের কাছে যায় তাহলে আমার পসার কমে যাবে। অমনি তিনি শিষ্যকে হুকুম বা আজ্ঞা দেন, তুমি অমুকের কাছে যাবে না, অমুকের সঙ্গ করবে না। এতে শিষ্যের উভয় সংকট হয়। কারন ঐ মহাত্মা বা বৈষ্ণব

মহাজনের কাছে গেলে গুরুর আজ্ঞা লংঘন হয়। আবার ঐ মহাজনের সেবা না করলে বৈষ্ণব অপরাধ হয়। "আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি শিষ্য গুরুভক্তির বশবর্ত্তি হইয়া গুরুর জৈষ্ঠ্য ভ্রাতাকে প্রহার করিয়াছেন। এখনও কোন কোন নামযাদা মহাত্মার শিষ্য সম্প্রদায়ে দেখা যায়, গুরুদেব আসিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়ান–প্রনাম করেন; কিন্তু সেইরূপ কিংবা তদপেক্ষা অধিক শাস্ত্র জ্ঞান-সম্পন্ন কোন মহাত্মা আসিলে শিষ্যগণ গ্রাহ্যও করেন না। এইগুলি শিষ্যের দোষ নহে, গুরুদেবের মাৎসর্য্যবশতঃ শিষ্যেরা এইরূপ শিক্ষা পায়।" (শ্রীমদ্ রাধাবিনোদ গোস্বামী ঃ বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি পৃ. ২৫)

গার্হস্থ্য আশ্রমে অবস্থানকারী কোন গুরুর যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ –অর্থাৎ ঠিক যাতে নিজের পরিবার পোষণ করা যায় এরূপ দান গ্রহণ করাই উচিত। অথচ অর্থ-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জাতগোঁসাইদের মধ্যে বেশীরভাগই বহু দানগ্রহণকারী হয়। অর্থাৎ আজকাল দেখা যায় নিজের অর্থের অভাব নেই–অথচ দেশে দেশে ভ্রমণ করে শিষ্য ছাড়াও অনান্যদের কাছ থেকেও বহু অর্থ এরা সংগ্রহ করে। কিছু জাতগোঁসাইকে আবার এসব অর্থ দ্বারা সুদী কারবারে লিপ্ত হতে দেখা যায়। জিজ্ঞেস করলে বলেন– শেষ জীবনে শ্রীবৃন্দাবনে অথবা নবদ্বীপে বসবাসের ইচ্ছা আছে। সেজন্য ঠাকুর সেবার জন্য কিছু সংগ্রহ করছি–আমার জন্য কিছু নয়, ইত্যাদি।

আসলে গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকা গুরুদেবকে শুক্ল বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। অর্থাৎ গুণবান ও সৎ শিষ্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সৎগুরুর কাছে শুক্ল–অর্থাৎ পবিত্র। বর্তমানকালে শুক্লবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন ধারণ করা অসম্ভব মনে হলেও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে দোষ কি? মোটামুটি অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে কারো বোধ করি শুক্লবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে না। তবে বিলাসিতার দাস হলে আর শুক্লবৃত্তিতে কেমন করে চলবে? অগত্যা নীচ সেবা, জাল, জুয়াচুরি, ভন্ডামি সবই করতে হবে। অথচ বিলাসের হাত ছাড়াইতে পারিলে আর কোন ভাবনা নেই। শুক্লবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করেই পরমানন্দে শ্রীহরিভজন করা সম্ভব। কিন্তু তথাকথিত জাত গোঁসাইরা শাস্ত্রের এই উপদেশ মানেন কি? আবার যারা গৃহস্থ নন সেসব সন্যাসী গুরুদেবের গতি কি? এর উত্তর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেই রয়েছে।

বৈরাগীর ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া যাচিয়া করে উদর ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আদেশই গৃহত্যাগী সন্যাসী গুরুদের গুরুবৃত্তির ব্যবস্থাপক। কিন্তু কে শোনে আর আচরণ করে?

জাত গোঁসাইদের মধ্যে বেশীরভাগই শিষ্যদেরকে গুরু পূজার উপর অতি গুরুত্ব আরোপের তাগিদ দেন। এই কারণে শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই গুরুপূজা নিয়ে মহাধুমধাম করে বসেন। তাই ইষ্ট দেবের পুজা করার পূর্বে ফুল-তুলসী দ্বারা কেউ কেউ গুরুপূজা করেন। কেউ বা গুরুদেবের পাদুকা (খড়ম) ফুল-তুলসী দ্বারা পুজা করেন। আবার গুরু স্বয়ং উপস্থিত থাকলে অথবা গুরুদেবের দর্শন পেলে ফুল-তুলসী দ্বারা তাঁর চরণ পুজা করেন। অথচ শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ অনুযায়ী প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলপদ্মে শ্রীগুরুর চিন্তা, স্নানের পর তিলকাদি ধারনের পর গুরুদেব কাছে থাকলে তাঁকে প্রণাম, ইষ্টদেবতার পূজার জন্য অনুমতি গ্রহণ এবং পূজার সময় "গুরুভ্যো নমঃ ইত্যাদিরূপে প্রণাম ছাড়া শ্রীগুরু পূজা সম্পর্কে আর কিছুই নেই। যদি অন্য কোন শাস্ত্রে থাকে তাহলে সেটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার নয়। শ্রীল জীবগোস্বামী পাদ শ্রীভাগবত সন্দর্ভে বলেন ঃ

"তথা পীঠপুজায়াং ভগবদ্‌বামে শ্রীগুরুপাদুকা পুজনমেবং
সঙ্গচ্ছতে। যথা, যত্রৈব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন
শ্রীগুরুরূপো বর্ত্ততে, সএব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ব বাম
প্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বে নাপি তদ্রূপো বর্ত্ততে।"

–অর্থাৎ পীঠপুজায় শ্রীভগবানের বামভাগে শ্রীগুরুপাদুকা পুজার এভাবে সামঞ্জস্য হয়। গুরুপাদুকা শব্দে অনেক শিষ্য গুরুদেবের খড়ম মনে করে তাঁর একজোড়া খড়ম পুজা করে থাকেন। কিন্তু গুরুপাদুকা শব্দে গুরুর খড়ম বুঝায় না। এক্ষেত্রে পাদুকা শব্দটি গৌরবার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গুরুপাদুকা শব্দের অর্থ স্বয়ং গুরুদেব। যে ভগবান্ ভক্তাবতার ব্যষ্টিগুরুরূপে জগতে প্রকাশিত আছেন, তিনিই সমষ্টিরূপে সাক্ষাৎ অবতার মূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের বামপ্রদেশে বিরাজ করেন।

শ্রীভগবান নিজে তাঁর তত্ত্ব অথবা ভজনপ্রণালী না প্রকাশ করলে বদ্ধজীবের সাধ্য নেই যে নিজের বুদ্ধি দ্বারা তা বুঝতে পারবে। এজন্যই তিনি গুরুরূপে নিজের তত্ত্ব জীবকে বুঝানোর দায়িত্ব নেন। শ্রীভগবান যে প্রকাশে নিজের তত্ত্ব বুঝান, ঐ প্রকাশের নামই "গুরু"। তিনিই আবার শ্রীভগবানের বামপাশের সমষ্টি গুরু। বদ্ধজীব ঐ মূর্ত্তি সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য তিনি জগতের কোন শ্রেষ্ঠভক্তের মধ্যে নিজের শক্তি সঞ্চার করে তাঁর

লেখক পরিচিতি

শ্রী মনোরঞ্জন দে মুন্সীগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত সিরাজদিখান উপজেলার রাজদিয়া গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু কায়স্থ পরিবারে ১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। মা-বাবা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাড়ীতে শ্রী রাধাকৃষ্ণের মন্দির থাকায় ছোটবেলা থেকেই শ্রী বিগ্রহদ্বয়ের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। লেখাপড়া করেছেন নিজ গ্রামের রাজদিয়া অভয় উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরবর্তীতে অগ্রণী ব্যাংকে উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার (সহকারী মহাব্যবস্থাপক) হিসাবে কাজ করেছেন। বি.এ (পাস), বি. এস. এস (সম্মান) এবং এম. এস.এস শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই লিখেছেন ২৫ টি।

শ্রী মনোরঞ্জন দে বিভিন্ন সময়ে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক নিবন্ধ লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির মাসিক পত্রিকা "সমাজ দর্পণ" এবং ইস্‌কন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "হরেকৃষ্ণ সমাচার" এবং ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকায় এ পর্যন্ত তার লিখিত বহু ধর্মীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। হরেকৃষ্ণ সমাচার এবং অমৃতের সন্ধানে-এ দু'টি ধর্মীয় পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক।

তিনি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ।